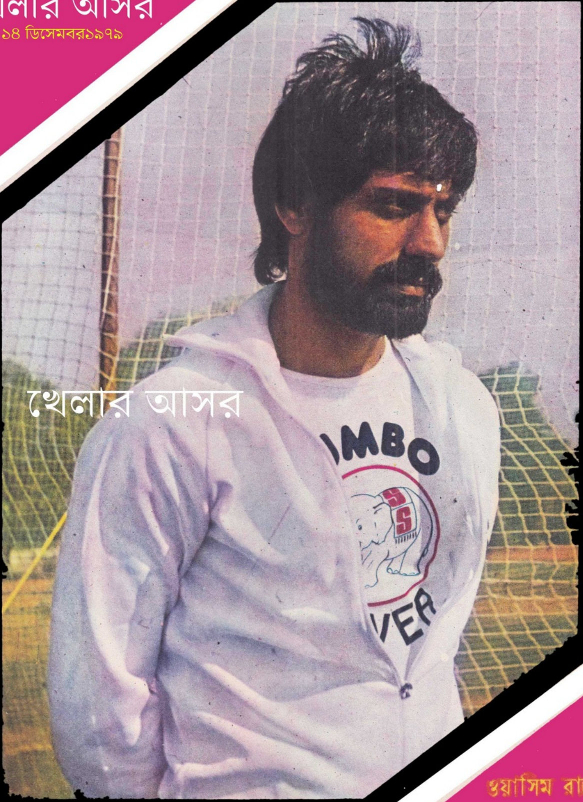
খেলার আসর

১৪ ডিসেম্বর১৯৭৯



ওয়াসিম রাজা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



রজার বিনি/গৌতম কয়াল

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ৩০ ।। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯

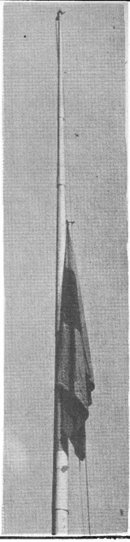
দিল্লিতে মোহনবাগানের ডুরাণ্ড কাপ জয় ভারতের ও বাংলার ফুটবলের কাছে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে নয় যে এবার নিয়ে মোহনবাগান ন'বার ডুরাণ্ড কাপ জয় করল এবং ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে একবার বেশি জয় করে রেকর্ড করল। কৃতিত্বটা নতুন করে বাংলার ফুটবলের। গতবছর ডুরাণ্ড ফাইনাল কলকাতার দুটি প্রধান দলের মধ্যে ঘরোয়া লড়াই হয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়। এবার ইস্টবেঙ্গল নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ডুরাণ্ডে অনুপস্থিত রয়ে গেল।

মোহনবাগান গত দু'বছরের ডুরাণ্ড ফাইনালের মধ্যে ১৯৭৭ সালে জয়ী হয়। এবার উত্তর ভারতে বাংলার ফুটবলের মর্যাদার প্রশ্নটি বড় আকারে মোহনবাগানের সামনে উপস্থিত হয়। মোহনবাগান যে পরীক্ষায় শুধু উত্তীর্ণ হয়েছে তাই নয়, বাংলার ফুটবলের প্রতি ভারতের দৃষ্টি নতুন করে আকর্ষণ করেছে।

সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা ঃ ১·৫০
বিমান মাশুল ঃ
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা





যা আছে

কার্টুন এঁকেছেন ঃ রাজা, পি জি ও আলি

প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন ঃ সন্তোষ ঘোষ।

অন্যান্য ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, ডি জে আনন্দরাজ, গৌতম কয়াল, শঙ্কর নাগ দাস প্রমুখ।

আমাদের বিশেষ ক্রিকেট সংখ্যার (৫—১২ অক্টোবর) প্রচ্ছদে (নীচের অংশ) প্রকাশিত ইডেন গার্ডেনের ছবিটি গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলার সময় খড়্গপুর আই আই টি-র ডাঃ সৌরদ্যুতি জোয়ারদার তুলেছিলেন।

ধ্যানচাঁদ—কেমন মানুষ ছিলেন

সুনীল বসু



'আজ শুধু নিরামিষ। যে মুহূর্তে শুনলাম ধ্যানচাঁদ নেই, তখনই একদিনের অশৌচ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ধ্যানচাঁদকে সারা বিশ্বই তো পুজো করে এসেছে হকির যাদুকর বলে, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি যে কত মহান, এই কলকাতায় আমি ছাড়া আর কেউ কি বলতে পারেন? এমন কি আমার স্বামীও পারবেন না, যদিও ধ্যানচাঁদের সঙ্গেই তো উনি বিদেশ সফর করেছেন।'

আমি থ!

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' মায়াদেবী বলে চললেন : 'বিয়ের আগেই তো ওই বিরাট পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমাদের লাহিড়ী বাড়ির। কলকাতায় খেলতে এলেই, ধ্যানচাঁদকে আমাদের বাড়িতে উঠতে হবেই। দলছুট হয়েও, এমন কি তার ভাই রূপ সিংকে বাদ দিয়েও। আগেই বলে রাখি, এই যে ওর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, এটা অন্যদের চেয়ে উনি যে মস্ত কেউকেটা ছিলেন বলে তা নয়। তা হলে রূপ সিংই বা হকিতে কি কম ছিলেন। আর তিনিই বা বাদ পড়তেন কেন?'

'এ ব্যবস্থা সেদিন থেকেই যেদিন ধ্যানচাঁদ ঝাঁসি হিরোস দল নিয়ে কলকাতায় আসেন ১৯৩৩ সালে বেটন কাপ খেলতে। বলে রাখি ওর সঙ্গে আমার বাড়ির লোকেদের পরিচয় হয় পঙ্কজ গুপ্তর সৌজন্যে। ক্রমে তিনি আমাদের বাড়িরই একজন হয়ে গেলেন।

কি বলব সেসব দিনের কথা। জানেন, হকি কি-ই বা বুঝতুম, আর খেলার মাঠে তখন মেয়েরা কতই বা যেতো। কিন্তু বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ধ্যানচাঁদকে নিয়ে মাঠেও খেলা দেখতে গেছি। একটু লোভও ছিল। অত নামী লোকের সঙ্গে একই গাড়ি থেকে নেমে মাঠের মধ্যে ঢোকা, তাও কি কম!'

'রক্তের সম্পর্ক সবাই বড় করে দেখে, কিন্তু সুদূর ঝাঁসির মানুষ ধ্যানচাঁদ যে কত নিকট আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলেন তা কি বলব। কি স্নেহই না আমাকে করতেন। দেখুন না এই ছবিটা। ওর নিজেরই ছবি, পেছন দিকে নাম সই করে পাঠিয়েছিলেন কোন্ মান্ধাতার আমলে।

'বোধহয় ধ্যানচাঁদের জন্যই আমার হকির ওপর একটা বিশেষ টান জন্মালো আর সেই টানেই বিয়েও হল একজন হকি খেলোয়াড়ের সঙ্গে।'

বলে রাখি এইখানে মায়াদেবী তিরিশ দশকের বিখ্যাত হকি রাইটব্যাক প্রভাস দাসের স্ত্রী। সেই ১৯২৮ সালের আমস্টার্ডাম ওলিম্পিকের পর থেকে প্রথম যে দুজন বাঙালী হকি খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন বিদেশ সফরে, প্রভাস দাস হলেন একজন। অন্যজন গোলরক্ষক নির্মল মুখোপাধ্যায়। তিনি আর নেই।

আবার মায়াদেবীর শুরু : 'হকি স্টিকেও ধ্যানচাঁদ যেমন জাদু জানতেন, আচরণেও তেমন।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিই বল না, তুমিও তো কত জানো।'

প্রভাস দাস এতক্ষণ নিঃঝুম হয়ে বসেছিলেন। আস্তে আস্তে মুখ তুলে বললেন, 'কি বলব ধ্যানচাঁদের কথা। কত কি না মনে আসছে। সেই ১৯৩৩ সালে—যেবার ঝাঁসি হিরোস জয় করল বেটন কাপ, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। কারণ একটা দুর্লভ সম্মান পেলুম প্রতিযোগিতার পরেই যখন জামসেদপুর শহরে প্রদর্শনী খেলতে ধ্যানচাঁদ একদাশের হয়ে খেলার সুযোগ পেলুম। অত বড় খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলতে পারা তো কম কথা নয়।'

'যেদিন শুনলুম দেশের হয়ে বিদেশে লড়ার সুযোগ এসেছে, সেদিনটা যেন স্বপ্নের মত। তখনকার কথা আপনারা বুঝবেন না। এখন তো দেখি বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, এগারোজনের হকি দল বানাতে ভারতের কর্মকর্তারা কি হিমসিম না খাচ্ছেন। আর তখন? মনে রাখুন, যে পাকিস্তানের হকিতে আজ বিশ্বজোড়া নাম তখনও তার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সে অংশকে বাদ দিয়েও তখন দেশ জুড়ে ডজন ডজন বাঘা বাঘা খেলোয়াড় পাওয়া যেত, যার ফলে দুটো তিনটে প্রথম শ্রেণীর দল গড়া যেত। এই কলকাতাই তো কত খেলোয়াড় জুগিয়ে এসেছে ভারতীয় দলে, অবশ্যই সবাই অ-বাঙালী। তাই যখন নির্মলদা আর আমার ডাক পড়ল নিউজিল্যাণ্ড সফরে যাবার জন্য, বাঙালী হয়ে আমাদের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। কি ভাগ্য আমাদের!'

'কিন্তু সফর শেষ হতে না হতেই বুঝলুম যে ভাগ্য শুধু দলে স্থান

পেয়েছি বলেই নয়, তার অনেক, অনেক গুণ বেশী ধ্যানচাঁদের মত অধিনায়ক পেয়েছিলুম বলে। আজ নির্মলদা নেই থাকলে তিনিও আমার কথায় সায় দিতেন।'

'খ্যাতির চূড়োয় বসে যে প্রতিভাবান মানুষটি, তিনি যে কি করে অমন স্নেহের চোখে সকলের ওপর দৃষ্টি রাখতেন ভেবে পেতুম না। নানা রাজ্যের, নানা ভাষার, নানা ধর্মের খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি যে দল, সবাই যেন এক হয়ে গিয়েছিলুম ওই পাঁচ মাস শুধু ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বের গুণে। খেলার মাঠে কি 'সিরিয়াস', কত পরামর্শই না দিতেন। অথচ অন্য সময় কত আপনজন, সকলের বন্ধু।'

'তিনি যে অত বিরাট, তিনিই যে সফরের একমাত্র আকর্ষণ, তা বুঝতেই দিতেন না। দলে তো আরো কত নামী খেলোয়াড় ছিলেন, তারাও কম শ্রদ্ধা করতেন না এই অহঙ্কার-শূন্য মানুষটিকে। ধ্যানচাঁদ ছাড়া সবাই যেন অসহায়। চলে যাওয়া সে সব দিন ভোলার নয়। কি করে ভুলতে পারি যে তিনি যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন যেন আমরাই এক একজন ধ্যানচাঁদ। কি বলব ধ্যানচাঁদের বিষয়, অমনটি আর হবে না।'

'আজকাল তো বিদেশ সফর শেষেই কত কি শুনতে পাই। কিছু কি শুনেছেন ধ্যানচাঁদের সময়? কি করে শুনবেন? স্বার্থপরতার অনেক ওপরে ছিলেন উনি। অথচ বলার অনেক কিছুই তো অনেকের সুযোগ ছিল। বিশেষ করে ভাই রূপ সিং দলে থাকার জন্য, তাও আবার তারই বাঁ পাশে, মানে লেফট ইনসাইডের জায়গায়। এখানে বলে রাখি রূপ সিংও কম ছিলেন না, ওঁর মত দক্ষ খেলোয়াড় কজনই বা হয়েছেন। আবার গোল করতেও তেমনি ওস্তাদ।'

'সত্যি কথা বলতে কি ধ্যানচাঁদের পাশে রূপ সিং যেন রামের পাশে লক্ষ্মণ। কিন্তু ধ্যানচাঁদের চরিত্রে পক্ষপাতিত্ব বলে কিছু ছিল না। নিজেও গোল দিয়েছেন প্রচুর, তার সঙ্গে রূপ সিংও, কিন্তু সেটা খেলার মাধ্যমেই, কোন বিশেষ একচোখামির ফলে নয়। ফাঁক বুঝে, যে যখনই সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারবে বুঝেছেন, সেখানেই বল গুছিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ভাই রূপ সিংই থাক বা অন্য কেউই থাক। এই যে ডান, বাম দুদিকে সমানভাবে বল যুগিয়ে যাওয়া, এ যে কত বড় শিল্পীর পরিচয় তা কি বলব। কিন্তু ধ্যানচাঁদের কাছে এতো সাধারণ ব্যাপার। মনে হত, মাঠের বাইরে সবাইকে যেমন সমানভাবে স্নেহ বিতরণ করতেন, মাঠের ভেতরে বল যোগানোর বেলায়ও তাই।'

'স্টিকের ভেল্কী! মাঝে মাঝে তো নিজের মনে ভাবতুম নিজের আয়ত্তে বল থাকা সত্ত্বেও কেন ধ্যানচাঁদ ঘুরিয়ে দিতেন অন্যদের জন্য। বল তো আঠার মত জড়িয়ে থাকতো তার স্টিকে আর যাদুমন্ত্রে এক এক করে অনেককেই অনায়াসে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারতেন।'

'কতবার তো দেখেছি বুলির পর একাই কারুকে বল না দিয়ে স্টিকের যাদুতে সারা মাঠ তরতরিয়ে যেতে, এমনকি গোলরক্ষকের পাশ দিয়েও। তারপর, গোলের ভেতর ঢুকে নিজেই শান্তভাবে বলটি হাতে তুলে ফিরে এসে সেণ্টারের বুলির জায়গায় আস্তে আস্তে বসিয়ে দিতেন। ভাব যে, গোল দিয়ে তো অন্যায় করেছি। তার ওপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে বল ফেরত দিতে বলব কেন? আজকাল কলকাতাতেই শুনছি গোল করেই কত লাফালাফি। ধ্যানচাঁদকে ভাবাই যায় না।

এমন যাদুকরের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ দল তো হিমসিম খাবেই ধ্যানচাঁদ একাই তো এগারোজনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন। আর রূপ সিংও কম ছিলেন না। তা হলে বুঝুন তাদের হাল। এ অবস্থায় মাথা কি সবসময় ঠিক রাখা যায়? কিন্তু কি অদ্ভুত কখনও দেখিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ধ্যানচাঁদের দিকে অন্যায়ভাবে স্টিক তুলেছেন। সেটাও ধ্যানচাঁদের গুণে। আমাদের বলতেন, স্টিক কৌশলের জন্য, আঘাত করার জন্য নয়, খেলা দেখাও, লাঠালাঠি কোরো না।

'সেই জন্যই তো ধ্যানচাঁদ আমাদের কাছেও যেমন শ্রদ্ধা পেতেন, প্রতিপক্ষর কাছেও তাই। যেন সকলেরই গুরু, সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। এই ভক্তি আদায় করতেন দর্শকদের কাছেও। আর দর্শকও কি সফরের প্রত্যেকটি জায়গায় কম হত। আজকাল তো শুনি এই কলকাতাতেই হকির বড় আসরও প্রায় ফাঁকা থাকে। এখনতো নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া হকিতে অনেক এগিয়ে গেছে, এমন কি গত ওলিম্পিকে সোনা রূপোও ভাগ করে নিয়েছে, কিন্তু তখন ওখানে হকির ওপর আজকের মত অত চাড় থাকার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, প্রচুর দর্শকের ভিড় হত আমাদের খেলা দেখতে। তার প্রধান কারণ ধ্যানচাঁদের টানে। ধ্যানচাঁদের যাদু কেউ কি না দেখে বসে থাকতে পারে?

'নেতা তো নেতাই। এমনটি আর পাবো না। মাঠে কি কড়া মেজাজ, কিছুতেই কোন ফাঁক বা ফাঁকি চলবে না। খেলাতেই হোক আর খেলোয়াড়ী নীতিতেই হোক। একবার আমি নিজেই ফাঁদে পড়েছিলুম, অবশ্য ইচ্ছে করে নয়।

'সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় খেলার সময়। একটি ম্যাচে বল একবার আমার দিকে বেশ জোরেই আসছিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে কোন সময় নষ্ট না করেই সমান জোরে ফেরত পাঠাতেই হল বিপদ। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বেগে আমার দিকে ধাওয়া করছিলেন, আমার ফিরতি মারের ফলে বলটি তার স্টিকে লেগে একেবারে মুখে। রক্তারক্তি কাণ্ড। যন্ত্রণায় তিনি যখন কাতরাচ্ছেন আর অন্যরা তার শুশ্রূষায় ব্যস্ত, ধ্যানচাঁদ দূর থেকে সোজা আমার কাছে এসেই কৈফিয়ৎ, 'সামনে একজনকে ছুটে আসতে দেখেও কেন তুমি বল না থামিয়ে অত জোরে মারলে?' কি বিরক্তিই না তার চোখে মুখে।

'আমতা আমতা করে বললুম, 'কি করব, তখনই না বল ফিরিয়ে দিলে, যদি গোল খেতুম।'

'অবাক হলুম ঝাঁঝালো প্রত্যুত্তর শুনে, 'একটা গোল বাঁচানোর জন্য তাই বলে তুমি বেপরোয়া বল মারবে? একটা গোল না হয় খেতুম, তার বদলে তোমায় আমি দশটা গোল ফিরিয়ে দিতুম। তা বলে মানুষ খুন করার মার? ছিঃ।'

'কি লজ্জা তখন। বুঝিয়ে দিলেন ধ্যানচাঁদ দলের স্বার্থ নিশ্চয়ই আগে, কিন্তু খেলার স্বার্থ যাকে বলে 'স্পিরিট', সবার ওপর।'

'লজ্জার তখনও আরো বাকী ছিল। ধ্যানচাঁদের বকুনি তখনও যেন শেষ হয়নি। খেলা আবার যেই শুরু হল, ধ্যানচাঁদ একাই একটি একটি



নিউজিল্যাণ্ডের মাঠে ধ্যানচাঁদ, মসিদ আমেদ ও প্রভাস দাস (সামনের দিকে)

করে গুনে গুনে দশটি গোল করার পরেই, আমার কাছে ব্যাকের জায়গায় হাজির। তখনও যথেষ্ট বিরক্তি তার গলায়, 'দেখলে তো, দশটা গোল বানালুম কিনা!'

'কি অদ্ভুত মানুষ, স্বরে বড়াইয়ের ছিটেফোঁটাও ছিল না, ছিল ক্ষোভ। যেন, আমার দোষে, তাকে একাই অতগুলো গোল করতে হল, অন্যদের একবারও ভাগ দিতে পারলেন না। তাকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হল আমার অপরাধের জন্য।

'লজ্জা আমার যাবার নয়, কিন্তু খেলা শেষের বাঁশি বাজতেই কেউ নয়, নেতা নিজেই এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন 'একটা সিগারেট খাওয়াবে'। সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে আলাপে ভুলিয়ে রাখলেন যেন আপনার বলতে ওর তখন শুধু আমি-ই। এসব কি ভুলতে পারি।'

'এই গোল দেওয়ার ব্যাপারেই আর একটা মজার কথা বলি। সফর শুরু করেছিলুম ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাদ্রাজ সহর থেকে, আর ওখানেই ফিরে এসেছিলুম পাঁচ মাস পরে। দুবারই মাদ্রাজে খেলতে হয়েছে, যেমন খেলেছি যাবার পথে শ্রীলঙ্কায়।

'অনেক কালের কথা, সব ঠিক মনে রাখতে পারি না। একটু এদিক ওদিক হতেও পারে। এটা বিস্তু মনে আছে যে, সফরে ধ্যানচাঁদ আর রূপ সিং-এর গোল সংখ্যা এমন ছিল যা যে কোন হকি খেলোয়াড় গর্ব করতে পারতেন। ধ্যানচাঁদ করেছিলেন কম করে দুশো একটি গোল। রূপ সিং একশো পঁচাশ। ফ্রাঙ্ক ওয়েলসও একশো পেরিয়েছিলেন, সেই কথাতেই আসছি।'

'মস্ত খেলোয়াড় ওয়েলস তখন নব্বইটা গোল করেছেন। হঠাৎ ঠাট্টার ছলেই, ধ্যানচাঁদকে বললেন, ক্যাপ্টেন, আমার তো সেঞ্চুরি হল না, এখনও দশ বাকী।'

'সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানচাঁদের উত্তর, 'কুছ পরোয়া নেই। সেঞ্চুরি আজই করিয়ে দেবো। তবেই তোমায় আমার কাছে কাছে থাকতে হবে, ওর পেতে জায়গা নিতে হবে। কি আশ্চর্য! খেলা হল। ওয়েলসেরও সেঞ্চুরি পূর্ণ হল। সব কটির মূলে ছিলেন একজন— ধ্যানচাঁদ।

'আরো মনে পড়ছে। ধ্যানচাঁদকে হাসতে হাসতে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন কৃতজ্ঞ ওয়েলস, 'ক্যাপ্টেন আপনারও তো ডবল সেঞ্চুরির মাত্র একটা গোল বাকী, তা কি দেখব না?' 'সেটাও দেখতে হবে?' ধ্যানচাঁদের যেন অনিচ্ছা। এলো একটি পেনাল্টি বুলি, যে নিয়ম পাল্টে বর্তমানে পেনাল্টি স্ট্রোক হয়েছে। ধ্যানচাঁদ হয়তো নিজে দায়িত্ব নিতেন না, অন্যদের সে ভার দিতেন। কিন্তু কি আর করবেন, ফ্রাঙ্ক ওয়েলসের যে ইচ্ছে ডবল সেঞ্চুরি দেখার আর দলের কারুর ইচ্ছা মানেই তো হুকুম। তাই ধ্যানচাঁদ পেনাল্টি বুলি নিজেই করলেন, গোলও দিলেন। যাক, তবু ওয়েলসের সাধ তো মেটানো গেলো। পরে অবশ্য আরো একটি গোল করে ধ্যানচাঁদের মোট গোল সংখ্যা দাঁড়ালো দুশো এক।

'খেলোয়াড় বলুন, দল-নেতা বলুন, এমনটি কি আর পাওয়া যাবে? দিকপাল, কিন্তু সকলের বন্ধু। সব ছাড়িয়ে, আমি বলব, মানুষ ধ্যানচাঁদের তুলনা হয় না। মনে পড়ছে দলের ম্যানেজার শ্রীপঙ্কজ গুপ্তর কথা, 'ধ্যানচাঁদ নিজেই জানেন না কি বিরাট পুরুষ তিনি'। তার প্রমাণ তো ওই সফরেই শুধু নয়, তার পরেও বহুবার পেয়েছি।'

'মনে হচ্ছে সেদিন, কিন্তু চব্বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। কলকাতায় এসেছেন ধ্যানচাঁদ, এসেছেন ১৯৪৮ সালের লণ্ডন ওলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী অধিনায়ক কিষেণলাল। কিষেণলালকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পরে বললেন, 'ওই যে মানুষটিকে দেখলে উনি মস্ত খেলোয়াড়, ও রকম আর হয় না'। সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব, 'মাপ করবেন, মস্ত খেলোয়াড় অনেক দেখেছি, অনেক দেখবো। আমার কাছে আপনিই প্রথম, আপনিই শেষ।' 'না, না, ও বল না'। ধ্যানচাঁদ যেন কুঁকড়ে গেলেন লজ্জায়।

'এই ছিলেন ধ্যানচাঁদ। আবার বলছি, ওরকমটি আর হবে না। শেষ দেখা বছর পনেরো আগে। এতদিন এইটেই ছিল সান্ত্বনা যে উনি আছেন। সফর শেষ করে ছাড়াছাড়ি হলেও সেই দলের কারুর দেখা পেলেই যেন নিকট আত্মীয় মনে হত। এক এক করে তো প্রায় সকলেই ছেড়ে গেলেন পৃথিবীর খেলা শেষ করে। এবার ধ্যানচাঁদও। আমারও তো বাহাত্তর চলছে। কবে আবার আমার নেতার দেখা পাবো তারই দিন এখন গুনে যাব।'

প্রভাস দাসের শেষ, আমার শুরু।

দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধানো একটি ছবির দিকে চেয়ে বললুম, ছবিটি কিছুদিনের জন্য যদি আমায় দেন।

প্রভাস দাস থমকে গেলেন। 'না ভাই, ওটা দিতে পারব না। ওটাই তো একমাত্র সম্বল। না, না, চোখের আড়ালে রাখা অসম্ভব।'

কথায় কিন্তু হারিয়ে দিলুম। বললুম, ধ্যানচাঁদকে আপনি অপমান করছেন তা হলে। ধ্যানচাঁদের যে নিঃস্বার্থ চরিত্রের দিক আপনি এত করে ফুটিয়ে তুললেন, স্বার্থপরের মত ছবিটি কেন তা হলে নিজের কাছে সবার আড়ালে রাখতে চান? দেশকে জানতে দিন খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের যৌবনের চেহারা। লোকে অনেক কিছুই ভুলে যায়, আর যেটা মনে করি, মাপ চাইছি আমার কথায়, ঠিক এই সময়ে আপনার বিশেষ কর্তব্য, ভবিষ্যৎ-এর জন্য তুলে ধরা বিশ্ব হকির প্রতীক। কথা দিচ্ছি ছবি ফিরে পাবেনই।

ছবিটিকে সঙ্গে নিয়ে যখন বেরিয়ে এলুম, তখন ছেড়ে এলুম এমন দু'জনকে যারা নিকট আত্মীয়ের মতই ধ্যানচাঁদের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান।

মনটা ভরে রইল একটি প্রশ্ন। খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ তো অমর হয়ে থাকবেন হকির যাদুকর বলে, কিন্তু মানুষ ধ্যানচাঁদ যে আরো কত বিরাট, তা কি ইতিহাস ফুটিয়ে তুলতে পারবে? কেমন করে জানবে ভবিষ্যৎ যে, মানুষ ধ্যানচাঁদ আরো অনেক, অনেক বড়!

আমিও তো বারো পেরোতেই খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদকে দেখেছি। ছোট থেকেই শুনে আসছি, উনি হকির যাদুকর। সেই ১৯৩৩ সালের বাইটন কাপে যাদুকরকে প্রথম দেখলুম অল ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফস এর বিরুদ্ধে। সেবার শেষ দেখলুম বাইটন ফাইনালে, প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা কাস্টমস। জিতলো ঝাঁসি হিরোস, জিতলেন দলনায়ক ধ্যানচাঁদ। ও বয়সে খেলার কিছু বুঝি আর না বুঝি, বাড়ি ফিরলুম বুক ভরা গর্ব নিয়ে—ধ্যানচাঁদকে দেখেছি।

তারপরেও বার কয়েক দেখেছি ধ্যানচাঁদকে স্টিক হাতে শিল্পীর তুলির টান দিতে। দেখেছি, বয়সের ভারে গতি মন্থর হলেও, কি নিখুঁত কব্জির কৌশলে সবাই-এর গা বাঁচিয়ে কেমন বল নিজের আয়ত্তে রেখে কখনও এগিয়ে যেতেন, কখনও জুগিয়ে দিতেন সঙ্গীদের। কোন তাড়াহুড়ো নেই, শান্ত, স্থির। যেমনি মাঝ মাঠে, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বীর গোলের সামনে। আর গোল করা? সে তো দেখবার মত যা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা যায় না। যত বেগেই দুধার থেকে সেন্টার আসুক, বল যেন আঠার মত স্টিকে আটকে যেতো, মুহূর্ত পরেই সামান্য কব্জির টোকায় গোলের ভেতরে।

খেলা থেকে শেষ বিদায়ও নিলেন এই কলকাতা থেকেই। তারপরই হল আমার মানুষ ধ্যানচাঁদের সঙ্গে পরিচয়। আর মানুষ হিসেবেও যে ধ্যানচাঁদ যাদুকর তারও প্রমাণ পেতে দেরী হল না।

ষাটের দশকে এক হকি খেলার আসরে শুরু করলেন, 'জন্মেছি

উত্তরপ্রদেশে, কিন্তু আমার হকির জন্ম কলকাতায়। তাই হকিতে কলকাতার ডাক এড়াতে পারি না। হকি থেকে যা কিছু পেয়েছি, সবই তো কলকাতার জন্য। কলকাতার কাছে হকির ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারব না।'

তারও পরে একটি সামান্য ঘটনা। কিন্তু মন থেকে কখনও মুছে যাবে না। ধ্যানচাঁদ বিদায় নেবেন কলকাতা থেকে এক সন্ধ্যায়। কেন জানি না, কোন উদ্দেশ্যও ছিল না, পা যেন আপনা থেকেই হোটেলের দিকে টেনে নিয়ে গেল। তা কি ধ্যানচাঁদের যাদু? অথচ তার সঙ্গে তেমন কিছু তো পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের সুযোগ অবশ্য অনেকবার এসেছিল, কিন্তু কেন জানি না যখনই ওই নিরহঙ্কার বিরাট ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হতুম, কোন কথা মুখে ফুটত না। ধ্যানচাঁদের যাদু?

কিন্তু যা বলছিলুম। হোটেলে গিয়েই ১৯৬০ সালের রোম ওলিম্পিকের অধিনায়ক লেসলি ক্লডিয়াসের সঙ্গে দেখা। চমকে গেলুম। দুজন দুই ভিন্ন যুগের মানুষ, দুজনেরই কত নাম, কিন্তু কি আন্তরিকতা!

সে সন্ধ্যার কথা ভুলব না। হাওড়া স্টেশনে অনেকেই ধ্যানচাঁদকে ট্রেনে তুলে দিতে চললেন। আমিও কি সুযোগ ছাড়তে পারি। চুপচাপ একটি গাড়ির এক কোণে জায়গা করে নিলুম।

বর্ষাকাল। আকাশে ঘনঘটা। স্টেশনে পৌঁছবার মুখেই তুমুল বৃষ্টি। ধ্যানচাঁদের মাথার ওপর, আর কেউ নয়, ক্লডিয়াস নিজে ছাতা সযত্নে ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন। কি সাবধানতা ক্লডিয়াসের। যেন একফোঁটা জলও যাদুকরের গায়ে না লাগে। যেন দেশের মহামূল্য রত্ন ক্লডিয়াসের কাছে গচ্ছিত আছে, নিরাপদে ফিরিয়ে দিলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত।

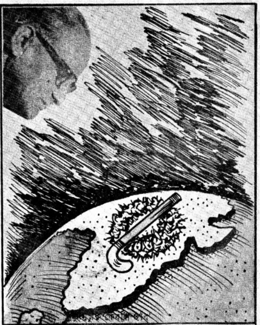
আরো চমক। কোন কামরায় ধ্যানচাঁদ উঠবেন তার হদিস করতে লম্বা স্টেশন চত্বরে একাই চললেন ক্লডিয়াস; বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা না নিয়েই। ট্রেনও লম্বা। অন্ধকারে কামরার ঠিকানা পাওয়াও মুস্কিল। ওপরের টিনের ছাউনি শেষ, তখনও নয়। খোলা আকাশ, ঝমঝম বৃষ্টি, তাতে ক্লডিয়াসের ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে খুঁজেও পেলেন। এমন সাধনা, এমন গুরুভক্তি কি বিফল হতে পারে?

ওই সন্ধ্যায় আমি ছাড়া লেসলি ক্লডিয়াসের ধ্যানচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শনের সাক্ষী হিসেবে আর কেউ ছিলেন না। কি ভাগ্য আমার! যাদুকর না হলে কি কেউ এমনভাবে কালজয়ী হতে পারেন, সবাইকে এমনভাবে টানতে পারেন?

প্রভাস দাসের দেওয়া ছবিটি সযত্নে বাড়ি নিয়ে আসার পথে কত কি না ছবির মত ভেসে উঠছিল। 'ছবিটি ফেরত দিও ভাই, বড় দামী আমার কাছে।'



যাদুকর ধ্যানচাঁদের ঝাঁসি হিরোস (১৯৩৬)



অনন্তলোকবাসী ধ্যানচাঁদের প্রতি মর্তের কার্টুনিস্ট আলির শ্রদ্ধা

দুঃখেও মনে মনে হেসেছিলুম প্রভাস দাসের কথায়। হায়রে, ছবি ফিরে পাবার জন্য কি ব্যাকুলতা! ধ্যানচাঁদের ছবি কি কোন ছোট ফ্রেমের ভেতর রাখা যায়? সে ছবির ফ্রেম তো সারা বিশ্ব জুড়ে। ধ্যানচাঁদ মানেই তো হকি।

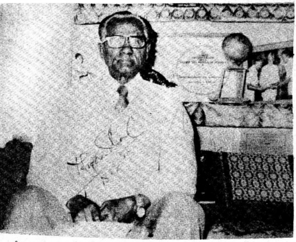
ভারতীয় হকিকে যে চোখ ঝলসানো রূপে ধ্যানচাঁদ এতো যত্ন করে সাজিয়েছিলেন, তার তো অনেক কালই মৃত্যু হয়েছে। ধ্যানচাঁদ ছিলেন তার প্রতীক। তিনি ও চলে গেলেন। পড়ে রইল শুধু একটি হকি-নাম—ধ্যানচাঁদ।

নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলংকা (সিংহল) সফরে ভারতীয় দল মোট গোল করেছিল ৫৮৪টি এবং ৪৯টি ম্যাচে বিপক্ষ দল গোল করেছিল ৪০টি। ভারতীয় দলের গোলদাতাদের নাম:

ধ্যানচাঁদ	২০১
রূপ সিং	১৮৫
ফ্র্যাঙ্ক ওয়েলস	১১০
সাহাবুদ্দীন	৩৯
ফার্নাণ্ডেজ	২২
ডেভিডসন	১৭
হরবেইল সিং	৭
মহম্মদ নঈম	১
মহম্মদ হুসেন	২
	৫৮৪

ভারতীয় দলে ছিলেন: গোল: টি ব্রেক (সিন্ধু) ও নির্মল মুখার্জি (বাংলা)। ব্যাক: মহম্মদ হুসেন (মানভাদার), প্রভাস দাস (বাংলা), রসিদ আমেদ (পাঞ্জাব)। হাফ ব্যাক: এরিক নেস্টর (বাংলা), এম এন মাসুদ (মানভাদার), এম জি গোপালন (মাদ্রাজ), মহম্মদ নঈম (পাঞ্জাব)। ফরোয়ার্ড: সাহাবুদ্দীন (মানভাদার), এল ডেভিডসন (বাংলা), ধ্যানচাঁদ (অধিনায়ক—আর্মি), রূপ সিং (গোয়ালিয়র), ফার্নাণ্ডেজ (সিন্ধু) ও হরবেইল সিং (পাঞ্জাব)।

ম্যানেজার: পঙ্কজ গুপ্ত।



পরিণত বয়সে ধ্যানচাঁদ, পিছনে হিটলারের উপহার সেই ঐতিহাসিক ট্রফি।

ধ্যানচাঁদ

নারায়ণ ওঝা : ধ্যানচাঁদ জন্মেছিলেন ১৯০৫ সালের, ২৯ আগস্ট এলাহাবাদে এক রাজপুত পরিবারে। পরে ধ্যানচাঁদের পরিবার এলাহাবাদ ছেড়ে ঝাঁসিতে চলে যায়। শৈশবের ছোট্ট-খাট্ট চেহারার রোগা দুর্বল ধ্যানের লেখাপড়া খুব বেশী হয়নি। লিখতে পড়তে পারতেন মাত্র।

ধ্যানের যখন ১৬ বছর বয়স তখন সামরিক বিভাগে দিল্লির প্রথম ব্রাহ্মণ রেজিমেণ্টে যোগ দেন একজন সাধারণ সিপাহী হিসাবে। বর্তমান শতকের বিশের দশকে ভারতে খেলাধূলার যেটুকু চর্চা ছিল, তার সবগুলোই বিভিন্ন সাম রিক ছাউনিকে কেন্দ্র করে। অন্যান্য অনেক খেলার মত ভারতীয় হকির জন্ম ও শৈশব অবস্থা কেটেছে ভারতের ব্রিটিশ সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে। ১৯২২ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে ধ্যানচাঁদ প্রথম হকি সংস্পর্শে আসেন। ঐতিহাসিক বিচারে বলতে গেলে স্বল্প মেয়াদী স্কুল জীবনেই ধ্যান হকির সঙ্গে পরিচিত হন, কিন্তু সেটা ঠিক খেলার পর্যায়ে পড়ে না।

সুবেদার-মেজর বাল তেওয়ারি নিজে ভালো হকি খেলতেন, এই খেলা অন্যান্যদের শেখাবার আগ্রহও ছিল খুব, তার চোখে পড়লেন ধ্যানচাঁদ। ছেলেটির সহজাত প্রতিভা ও উৎসাহ দেখে বাল তেওয়ারি ধ্যানকে শিষ্য করে নিলেন। প্রথম থেকেই এ খেলার প্রতি ধ্যানের অদ্ভুত ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

ধ্যানের জীবনের প্রথম বড় খেলা দিল্লিতে বার্ষিক মিলিটারি টুর্নামেণ্টে নিজের রেজিমেণ্টের প্রতিনিধি হয়ে।

ধ্যানের হকি জীবনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঝিলমে পাঞ্জাব ইণ্ডিয়ান ইনফ্যাণ্ট্রি টুর্নামেণ্টের ফাইনাল খেলা। ধ্যানের দল দু'গোলে পিছিয়ে ছিল, খেলার বাকি মাত্র ৪ মিনিট। কম্যাণ্ডিং অফিসার ধ্যানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যা হোক কিছু একটা করো, মাত্র চার মিনিট বাকি।' ধ্যানচাঁদ সত্যিই কিছু করেছিলেন, চার মিনিটে তিনটি গোল দিয়ে দলকে জিতিয়ে দেন। হকির যাদুকর খেতাবটি পান সে সূত্রেই।

এরপর ১৯২৬ সালে ভারতীয় সামরিক হকি দলের হয়ে ধ্যানচাঁদ নিউজিল্যাণ্ড সফরে যান। নিউজিল্যাণ্ডবাসীর মুখে মুখে তখন একটিই নাম, 'ধ্যানচাঁদ'। এমন অসাধারণ খেলার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। এই সাফল্যের পর '২৮ সালের আমস্টার্ডাম ওলিম্পিকে ভারতীয় দলে তার নির্বাচন নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তার কারণ ঘটেনি।

আমস্টার্ডাম ওলিম্পিকে প্রথম খেলা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। ভারত জিতল ৬—০ গোলে, তার মধ্যে চারটি গোলের কৃতিত্ব সেণ্টার ফরোয়ার্ড ধ্যানচাঁদের। এরপর বেলজিয়াম (৯—০), ডেনমার্ক (৫—০) ও সুইজারল্যাণ্ড (সেমিফাইনাল ৬—০) কে হারিয়ে ফাইনালে মুখোমুখি হল হল্যাণ্ডের। একাধিক খেলোয়াড়ের অসুস্থতার জন্য ভাঙা দল নিয়ে ভারত ফাইনালে খেললো। মূলত ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে ভারত সে খেলায় জয়ী হয়ে বিশ্ব হকিতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল। হল্যাণ্ডের লোকেরা ধ্যানচাঁদের খেলায় খুশী হয়ে তাকে একটি সিগারেট কেস উপহার দেন।

নবম ওলিম্পিয়াড থেকে ফিরে আসার পর ধ্যানের বাড়িতে সকাল সন্ধ্যে কচি কাঁচাদের ভিড়ে জমজমাট থাকতো। তারা সকলেই ধ্যানের মুখ থেকে শুনতে চায় ওলিম্পিকের গৌরবময় সাফল্যের কথা। সেই ভিড়ে আরেকটি ছেলে সারাক্ষণ হাজির থাকতো, সে ধ্যানচাঁদের ছোট ভাই রূপ সিং—তখন উঠতি খেলোয়াড়।

পরের ওলিম্পিক লস এঞ্জেলস, ১৯৩২। এবার ধ্যানের সঙ্গে দলে জায়গা পেলেন ভাই রূপ সিং ইনসাইড-লেফটের খেলোয়াড় হিসাবে। সেখানে ভারতের কাছে আমেরিকা হারল ২৪-১ গোলে : এটা এখনো পর্যন্ত ওলিম্পিক রেকর্ড। চব্বিশটি গোলের মধ্যে ধ্যানচাঁদ আটটি ও রূপ সিং দশটি গোল করেন। স্থানীয় এক সংবাদপত্রে তখন মন্তব্য করা হয়েছিল, 'আমেরিকা-ভারতের খেলাটি সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তরে আনতে হলে, ধ্যানচাঁদকে বাঁ হাতে স্টিক ধরতে হবে অথবা বরফের জুতো পরে খেলতে হবে।' লস এঞ্জেলস থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা নিয়ে ফিরল ভারতীয় হকি দল।

পরের ওলিম্পিক বার্লিন, ১৯৩৬। ধ্যানচাঁদের ওপর দলের অধিনায়কত্বের ভার, ফাইনালে উঠল জার্মানি ও ভারত। বৃষ্টি ভেজা মাঠে অসম্ভব দ্রুত গতিতে খেলা হচ্ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ধ্যানচাঁদ পায়ের কাঁটাওয়ালা জুতো আর মোজা খুলে ফেললেন, পরে নিলেন রবার সোলের একটা জুতো। এবার বুঝি ধ্যানচাঁদ বলের গতিতেই মাঠে ছুটছেন। সে খেলায় ভারত জিতল ৮-১ গোলে। ধ্যানচাঁদ তারমধ্যে একাই গোল করেছেন ছ'টি। হিটলার অভিভূত হয়ে ধ্যানচাঁদকে সম্বর্ধনা জানালেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ধ্যানচাঁদ তখন সামান্য একজন নায়েক, হিটলার বললেন, জার্মানিতে এলে তাকে তিনি মেজর জেনারেল করে দেবেন।

পাঁচ মাসের সফরে ১৯৩৫ সালে ধ্যানচাঁদ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরে যান। সে সফরে ধ্যানচাঁদ গোল করেন ২০১টি, ভাই রূপ সিং ১৮৫টি গোল।

ধ্যানচাঁদ কর্মজীবন থেকে অবসর নেন একজন মেজর হিসাবে, এবং তারপরেই পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব স্পোর্টসে হকি প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত হন। পদ্মভূষণ উপাধি পান ১৯৫৫ সালে।

ধ্যানচাঁদ শেষ আন্তর্জাতিক হকি খেলেছিলেন ১৯৪৮ সালে। সে বছর ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়ে পূর্ব আফ্রিকা সফরে যান। সফর থেকে ফিরে এসে আর কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নেননি। ধ্যানচাঁদ আন্তর্জাতিক হকিতে মোট গোল করেন প্রায় চারশোর মত।

ধ্যানচাঁদের নিজস্ব দল ছিল ঝাঁসি হিরোস। কলকাতায় ধ্যানচাঁদ যতবার খেলতে এসেছিলেন, একমাত্র এই দলের হয়েই খেলেছেন। ঝাঁসি হিরোস বাইটন কাপ জেতে '৩৩ সালে।

হাসপাতালে ধ্যানচাঁদের চিকিৎসা কেমন হয়েছিল



বিশেষ প্রতিনিধি : ঝাঁসীতে গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়ার পর ২৩ নভেম্বর হকির কিংবদন্তী, বিশ্ব হকির গৌরব ধ্যানচাঁদকে দিল্লির অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। প্রথমে তার স্থান হয়েছিল জেনারেল ওয়ার্ডে। কলকাতার ইস্টার্ন রেলওয়ে হকি দলের ম্যানেজার এবং ধ্যানচাঁদের স্নেহধন্য বিমল ভৌমিক ওই সময়ে নেহরু হকি টুর্নামেণ্টের জন্য দিল্লিতে ছিলেন। তারই অনুরোধে দুই ছেলে অশোক কুমার ও রাজকুমার ধ্যানচাঁদকে ঝাঁসী থেকে দিল্লি নিয়ে যান যাতে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

জেনারেল ওয়ার্ডে 'হকির যাদুকরকে' রাখা নিয়ে খেলোয়াড় মহলে এক তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং অবস্থা এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে মোহনবাগানের কোচ পি কে ব্যানার্জি ডুরাণ্ড ফাইনাল খেলতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত ধ্যানচাঁদের জন্য কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ভাল করে চিকিৎসা শুরু হয়েছিল কিনা এ নিয়ে নানারকম কথা উঠছে। ৩০ নভেম্বর পি কে ব্যানার্জি ও বিমল ভৌমিক কেবিনে রাখা রোগীর বেড কার্ডে লেখা এমন মন্তব্য লক্ষ্য করেন যে যাতে মনে হয় ধ্যানচাঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটছে। এমন কি ১ ডিসেম্বর সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহার প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া মেডিক্যাল বুলেটিনে একথা স্বীকার করা হয়েছে। অথচ ৩ ডিসেম্বর ভোর রাতেই সব শেষ।

ধ্যানচাঁদের স্ত্রী বাবা তারকনাথের কাছে মানত করার জন্য বিমল ভৌমিককে অনুরোধ করেছিলেন। ধ্যানচাঁদ বিমল ভৌমিকের কাছে আব্দার করেছিলেন। 'মছলি খিলাও'। পি কে ব্যানার্জি ধ্যানচাঁদের পা টিপছিলেন তখন। মোহনবাগান ডুরাণ্ড ফাইনালে উঠেছে শুনে বলেন 'জিতো বেটা'।

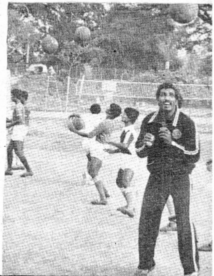
সাব জুনিয়র ফুটবল দলের প্রশিক্ষণ



ভারতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবল দল। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে পি মনোজ, বনি ফার্নাণ্ডেজ, বি ভট্টাচার্য, জেমস, অনিমেষ চক্রবর্তী, রামা রাও, নকপাং কোনিয়ার্ক, সম্পৎ কুমার (প্রশিক্ষক), বি ডি মুরলিধর (অধিনায়ক), আমির হুসেন, রবি চন্দ্রন, আর ডি বাবু, মনিভন্মন, অনুপ ভট্টাচার্য। বাঁদিক থেকে বসে—অপূর্ব রায়চৌধুরী, প্রদীপ হোড়, সুকান্ত পাল, শেখর শেঠ



সিঙ্গাপুরেযে সাব-জুনিয়র ফুটবল দলটি খেলতে যাচ্ছে তারই ছয় বাঙালী সদস্য—বাঁদিক থেকে অনিমেষ চক্রবর্তী, অপূর্ব রায়চৌধুরী, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুকান্ত পাল, প্রদীপ হোড় ও শেখর শেঠ







বাঙ্গালোরে সাব-জুনিয়র ফুটবল টিমের প্রশিক্ষণ

ছবিঃ ডি জে আনন্দরাজ

জাতীয় ফুটবলে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, কেরালা দারুণ লড়তে পারে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সন্তোষ ট্রফিতে উদ্যোগী রাজ্য দলকে কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে খেলিয়ে দেবার বরাবরের রেওয়াজটাকে ভাঙচুর না করে এবারেও গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। উদ্যোগী রাজ্য তামিলনাড়ু প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে গুজরাট ও হরিয়ানার মতো দলকে। 'এইচ' গ্রুপ থেকে তামিলনাড়ু খুব সহজেই তাই পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলাও পেয়েছে সহজ গ্রুপ। জম্মু ও কাশ্মীর এবং পণ্ডিচেরীর মতো দলকে হারাতে একদম বাংলাকে বেগ পেতে হবে না। 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলাকে প্রথম খেলতে হবে কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে 'ডি' গ্রুপের বিজয়ীর সঙ্গে। 'ডি' গ্রুপে হিমাচল প্রদেশ ও ওড়িশার চাইতে যথেষ্ট বেশি শক্তিশালী দল কর্ণাটক। লিগ পর্যায়ের খেলায় বাংলা খেলবে এক নম্বর ক্লাস্টারে। এই ক্লাস্টারে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কেরালা, মহারাষ্ট্র বা অন্ধ্রপ্রদেশ। শেষ দুই রাজ্য খেলছে একই গ্রুপে। চার দলের এই 'সি' গ্রুপে অন্যরা সিকিম ও দিল্লি। শ্রীনগর ন্যাশনালের মতো এবারেও দিল্লি থেকে দু'টি রাজ্য দল হানা দিতে পারে। এ আই এফ এফ কর্তারা রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের ঝামেলার মধ্যে এবছরেও কেমনভাবে বিনা অসন্তোষে জাতীয় ফুটবল ভালোয় ভালোয় শেষ করেন তা দেখার আছে।

কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে দু'নম্বর ক্লাস্টারে সম্ভবত খেলবে সার্ভিসেস, গোয়া, তামিলনাড়ু এবং পাঞ্জাব বা রেলওয়েজ। মণিপুর, পাঞ্জাব ও রেলওয়েজ মিলিয়ে 'এফ' গ্রুপেই হবে প্রাথমিক পর্বে সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডির লড়াই।

আঠারো বারের চ্যাম্পিয়ন এবং দু'বার একটানা চার বছর সন্তোষ ট্রফি জয়ের রেকর্ডধারী বাংলাকে এবারে বেগ দেবে পাঞ্জাব, গোয়া, মহারাষ্ট্র ও কেরালা। রেলওয়েজ ও সার্ভিসেস যথেষ্ট শক্তি নিয়ে কোয়েম্বাটুরে হাজির হচ্ছে সেমিফাইনাল খেলার দাবি নিয়ে।

উনআশির মরশুমে কলকাতায় নানা রাজ্য থেকে স্টার প্লেয়াররা খেলতে এলেও, বাংলার তিন প্রধান দল পুরো বছরটায় বাইরের টুর্নামেন্টগুলোতে প্রায় কোণঠাসা হয়ে ফিরে এসেছে বলা যায়।

তারকা-বিহীন পাঞ্জাব ফুটবলে আবার নতুন করে ফুঁসে উঠছে ভালো খেলে। পাঞ্জাবের দলগুলোর দাপট দেখা গেছে ফেডারেশন কাপ ও ডুরাণ্ড সহ অন্য সব বড় প্রতিযোগিতাগুলোতে।

উনসত্তরে হওয়া রোভার্স, স্ট্যাফোর্ড ও নাগজী ফুটবল প্রতিযোগিতায় গোয়া থেকে যোগ দেওয়া দল তুখোড় খেলেছিল। গোয়ার এখনকার সেরা প্লেয়ার ফ্রান্সিস ডি'সুজা অবশ্য খেলতে পারবেন না আগামী বছর কলকাতায় খেলার জন্য ছাড়পত্র দাখিল করাতে।

প্রসূনকে অধিনায়ক করে বিশ জনের বাংলা দল মনোনীত করাটা হয়েছে এককথায় চমৎকার। সারা বছরের পারফরমেন্সের নিরীখে এই দলের বাইরে অন্য কোন ভালো বিকল্প ভাবাই যায় না। নির্বাচকরা গত বছরের মতো এবারেও কিছু তরুণকে দলে ঠাঁই দিয়েছেন। তবে স্ট্যাণ্ডবাইতে তরুণদের নাম তোলাতে কিছু তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল খুব স্বাভাবিক কারণে। উঠতি ভালো খেলোয়াড়দের বিকল্প কলকাতায় থাকে অনেক বেশি।

পাঞ্জাবের তিন তারকা কোচিং ক্যাম্পের আগেই বাংলা ছাড়ার আবেদন করেছিলেন। পরে তারা আবার তা প্রত্যাহার করেন। সেজন্য সন্তোষ ট্রফি দলের জন্য নির্বাচকদের কাছে ওদের নাম নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগই ছিল না।



কোয়েম্বাটুরগামী বাংলা দল / শংকর

বাংলার কাছে প্রতিটি ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ ঃ অচ্যুৎ ব্যানার্জি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় ফুটবলে যাওয়ার আগে গত চার বছরের বিজয়ী বাংলা দলের খেলোয়াড়রা তাদের শেষ প্র্যাকটিস করল ৪ নভেম্বর। এদিন নির্বাচিতদের মধ্যে বাংলা তথা ভারতের তিন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়—সুব্রত ভট্টাচার্য গৌতম সরকার ও শ্যামল ব্যানার্জি ছাড়া বাকিরা সকলেই আই এফ এ মাঠে হাজির—

কোয়েম্বাটুর যাওয়ার আগে আই এফ এ মাঠে বাংলার আক্রমণের দুই অস্ত্র মানস ও সুরজিতকে শানাচ্ছেন কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জি / শংকর



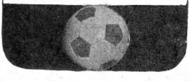


কোচিং ক্যাম্পে শেষ দিনের দৌড়, রয়েছেন ডেভিড, সুরজিত, প্রসূন, নাসির, কম্পটন, দেবাশিস, সুকুমার, মানস, অমলরাজ, চিন্ময়, ফিলিপ, প্রতাপ, মনোরঞ্জন, দিলীপ পাল ও ভাস্কর / শংকর

ছিলেন।

শেষ দিনের ট্রেনিং শিডিউলে কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জি দলের খেলোয়াড়দের শ্যুটিংয়ের ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। গোড়াতেই হাল্কা দৌড়ে খেলোয়াড়রা গা গরম করে পুরো সময়টাই গোল লক্ষ্য করে দু'দিকের বারে দমাদম সট মারা প্র্যাকটিস করেছেন। গোল-রক্ষার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন প্রতাপ, ভাস্কর, নাসির এবং খিদিরপুরের তরুণ গোলকিপার দিলীপ পাল। অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জিকে শ্যুটিং প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে কোচের সঙ্গে বারকয়েক কথাবার্তা বলতেও দেখা গেল।

এদিন প্রসূন বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন। এবারে জাতীয় ফুটবলে হট ফেভারিট বাংলার অধিনায়কত্ব প্রসূনের কাঁধে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য সদ্য সমাপ্ত আরবশাহী সফরে ভারতীয় ফুটবল দলেরও অধিনায়ক ছিলেন প্রসূন। সেখানেই অধিনায়কের দায়িত্ব পালনে প্রসূন যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার ফায়ারিং স্কোয়াডের নির্বাচিত গোলন্দাজদের প্রয়োজন মত উৎসাহ বাড়িয়েছেন, কোচ যখন জুনিয়র খেলোয়াড়দের প্রয়োজন মত ভুলগুলি শুধরে দিচ্ছিলেন তখন নিজেও পাশে দাঁড়িয়ে কোচের কথা শুনেছেন। শ্যুটিং প্র্যাকটিসের প্রথমে কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জি বাংলার আক্রমণের দুই মোক্ষম অস্ত্র সুরজিত সেনগুপ্ত ও মানস ভট্টাচার্যকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর অবশ্য মানসকে প্র্যাকটিস দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুরজিত নিজে। উত্তর দিকের বারে বিদেশ, চিন্ময়, কম্পটন, মনোরঞ্জনরাও প্র্যাকটিস করেছেন সুরজিতের সঙ্গে। অন্যদিকের বারে বাংলা দলে নবাগত ডেভিড উইলিয়ামস, দেবাশিস রায়কে চলতি বলে গোলে মারায় সাহায্য করছিলেন



প্রেমনাথ ফিলিপ, অমলরাজ ও সুকুমার মুখার্জি। হার্ড হিটার হিসেবে ডেভিড কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জির নির্দেশ মত বেশ কিছুক্ষণ চলতি বলে আউট স্যুয়িং সট মারাও প্র্যাকটিস করলেন। প্রথম প্রথম বাইরে গেলেও পরবর্তীতে বেশ সাফল্য পাচ্ছিলেন ডেভিড। সে সময় প্রসূনও সেখানে হাজির ছিলেন। খেলার মাঠে এবং মাঠের বাইরে মানস সমান ছটফটে। এদিনও সিরিয়স প্র্যাকটিসের একঘেয়েমি ভাবটা খেলোয়াড়দের ছুঁতে পারেনি মানসের উপস্থিতিতে। সাব্বির পায়ে চোট নিয়ে ড্রেস করে মাঠে নামলেও শ্যুটিং প্র্যাকটিস করতে পারেননি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি সাব্বিরের আঘাত খুব সিরিয়স নয়।

প্র্যাকটিসের পর টিম সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জি বললেন, নতুন করে বলার নেই। আমার ছেলেরা প্রত্যেকেই নিজের পজিসনে ভারত সেরা। কোন্ দলকে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ বলে ভাবছেন? এর উত্তরে কোচের সিরিয়স উত্তর—কোন দলকেই কমজোরী প্রতিপক্ষ ভাবা উচিত নয়। প্রথম থেকে শেষ, প্রতিটি ম্যাচই আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।



"ট্রফি ফিরিয়ে আনতেই হবে"

'যে ট্রফি নিয়ে যাচ্ছ—সে ট্রফি ফিরিয়ে আনতেই হবে।' বৃহস্পতিবার ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বেশ কিছু ফুটবল-পাগলের এই দাবী সোচ্চার হয়েছিল হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে—'করমণ্ডল এক্সপ্রেসের' একটি কামরা ঘিরে। বাংলা দলের ফুটবলাররা কোচ ও ম্যানেজার সহ ছিলেন ওই কামরাতেই। ওরা যাচ্ছেন কোয়াম্বাটুরে 'সন্তোষ ট্রফি' খেলতে। গতবছর বাংলা কাশ্মীর থেকে ট্রফি জয় করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল—সেই ট্রফি এবার নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে করে। ওদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন যারা তাদেরই দাবী ট্রফি আবার বাংলায় আনতেই হবে।

অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি ও অন্যরা আশাবাদী, দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ওরা যাচ্ছেন। সকলেই ভাল মেজাজে ও সুস্থ অবস্থায় যাচ্ছেন। ব্যতিক্রম তিনজন—সুরজিত সেনগুপ্ত, গৌতম সরকার ও সুব্রত ভট্টাচার্য—ওরা নানা কারণে দলের সঙ্গে যাননি। পরে গিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কিছু জানতে চাইলে বললেন—'এখন নয় ফিরে আসি তারপর। না— আমরা ছবিও দেব না, বলতে পারেন কুসংস্কার কিন্তু ছবি আমরা তুলতে দেব না, আমরা কখনও খেলতে যাবার সময় দিই না।' প্রসূন ও সহ খেলোয়াড়রা কিন্তু এদিন অক্লান্তভাবে অটোগ্রাফ দিয়েছেন।

আপনি কি শুধু গল্প-উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন? তাহলে এ বিজ্ঞাপন পড়বেন না।

আপনি যদি বিচিত্র স্বাদের লেখার ভক্ত হন
তাহলে এ বিজ্ঞাপন পড়ুন, আর অবশ্য পড়ুন

পরিবর্তন



পরিবর্তন

দেড় বছরও বয়স হয়নি। এর মধ্যেই পরিবর্তন বাংলা পত্রিকা জগতে এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গত এক বছরে পরিবর্তনে যে-সব বিশিষ্ট লেখা বেরিয়েছে তার মধ্যে আছে—যৌতুক যুগে যুগে ; বেকার ভাতা কারা পেল ; শ্রদ্ধা-মাতা কাহিনী ; ডি ভি সি মানে ডোবানো-ভাসানো করপোরেশন ; জোয়ার-ভাঁটার বিদ্যুৎ ; জোড়াতালি দিয়ে উপজাতি সমস্যা মিটবে না ; হজে যাবো, সারা জীবনের স্বপ্ন ; মুসলমান মেয়েরা জাগবে কবে ? শান্তিনিকেতনে কেন এত অশান্তি ? উৎপল দত্তের নাটকে বিপ্লব ; বাংলা সাহিত্য কলকাতা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে ; চাকরির আশায় ক্যাথলিক যুবক ব্রাহ্মণ পদবী নিচ্ছে !—সবই বিচিত্র স্বাদের বিতর্কমূলক লেখা।

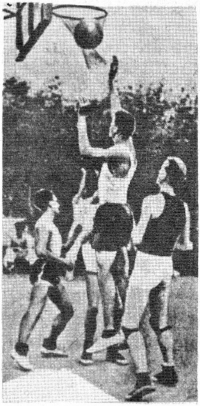
আপনি **পরিবর্তন** পড়েননি ? তাহলে আপনার চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং মন ভরে দেবে এমনি আরো বহু লেখা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন।

পরিবর্তন প্রতিটি সংখ্যাই তার আগের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, দু-একটি সংখ্যা সংগ্রহ করেই দেখুন না, ভালো লাগতেও পারে।

ইত্যাদি প্রকাশনী,
৪৭, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭২
ফোন ঃ ২৭৩৩১৬, ২৭২১৬৯

কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (২৩)

স্বরাজ ঘোষ ঃ প্রশিক্ষণ কালে স্কিল পর্বটি বড়ই নীরস। কারণ, এটাই ফুটবলের ব্যাকরণ। শিক্ষার্থীদের কাছে এই সময়টা অনেকটা কাল-রাত্রির মত। তাদের কাছে তখন মনে হয়, কবে এই পর্বটি শেষ হবে। অথচ স্কিল ছাড়া ফুটবলের কন্সট্রাকশন অর্থাৎ খেলার প্ল্যান, প্রোগ্রাম, ট্যাকটিক্স ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তাই করা যায় না। কাজেই স্কিল-গুলো শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে আয়ত্ত করানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষক ত্রুটিগুলো বারবার ডিটেক-শন অর্থাৎ বাধা দিয়ে সংশোধন করান। এই মুহূর্তগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আরও নীরস মনে হয়। প্রশিক্ষকের এই ধরনের ডিটেকশন যেমন অপরিণত খেলোয়াড়দের কাছে এক এক সময় বিরক্তিকর ও একঘেয়েমি মনে হয়, তেমনি আবার পরিণত খেলোয়াড়দের কাছেও বিরক্তিকর মনে হয়। শিক্ষার্থীদের মানসিকতা সেই পর্যায়ে পৌছলে সাধনার স্বাভাবিক গতি ও কর্মের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রশিক্ষক বুঝতে পারেন, কর্মানুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসার গতি মন্থর হয়ে এসেছে। অথচ কর্মানুষ্ঠান যতই নীরস হোক, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাকে এগোতেই হবে। গীতায় কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, 'কর্ম-যোগের অর্থ কর্মের কৌশল—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কর্মানুষ্ঠান। কর্ম কি? কি করে করতে হয় জানতে পারলে তবেই কর্ম হতে সর্বাপেক্ষা ফল পাওয়া যায়।' তাই ফুটবল খেলার মূল উপাদান—স্কিলগুলোকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে জানতে হলে যে কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় সেটাই হল প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্মযোগ। যেমন শিক্ষার্থীদের স্কিলগুলো অধিগত করার কৌশল প্রশিক্ষকের জানিয়ে দেওয়া। আবার শিক্ষার্থীদের কৌশলগুলো অধিগত করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষকের প্রতি



অনুরাগ ভরে আত্মসমর্পণ করে নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ হে প্রভু, তুমি যেভাবে আমায় নিযুক্ত করবে সেইভাবে আমি কর্ম করব।

কাজেই প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুরোগের প্রতি ভাঁটার চিহ্ন দেখতে পেলেই তিনি তার কর্মধারা বদলে ফেলেন ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতার দিক ঘোরাবার জন্য তিনি কতক-গুলো স্কিল-গেম অর্থাৎ স্কিল খেলাধূলার আয়ো-জন করেন। যেমন ফুটবল-রিলে। অর্থাৎ দুটি দল করে স্কিলে রেসের মত (ব্যাটমের পরিবর্তে) ফুটবল নিয়ে রিলে রেস। তাতে যেমন একদিকে শিক্ষার্থীদের মন পরিবর্তন হয় ও আনন্দের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। আবার সহনশীলতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কতকগুলো ড্রিল গেম আছে। তন্মধ্যে যেমন হিউম্যান ট্রলি বা হুইল ব্যারো রেস। তাতে সহনশীলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আবার হাতের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তা গোলকিপার ও অন্যান্য পজিসনের খেলো-য়াড়দের থ্রো-ইন-এর ব্যাপারে সাহায্য করে।

এদিকে আবার খেলা পরিস্থিতির মত স্থান পরিবর্তন, দলগত ঐক্যবোধ বোঝাপড়া, অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস, বল থ্রো করা, ডজ দেওয়া, ক্রমাগত আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ করার ক্ষমতা অর্জন, তৎপরতা, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও নির্বাচন শক্তি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে ফুটবল খেলোয়াড়দের বাস্কেটবল খেলা খুবই কার্যকরী হয়। এই খেলার মধ্য দিয়ে সব পজিসনের খেলোয়াড়, এমনকি গোল-কিপারেরও বিভিন্ন স্কিল অনুশীলন হয়।

পাসিং ও সুটিং নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে টেনিস ফুটবল যথেষ্ট সাহায্য করে। আবার হেডিং ও অ্যাথলেটিক্স ফিটনেসের জন্য ভলিবল খেলার মত (হাত দিয়ে বল মারার বদলে) হেড-ভলিবল খেলাও ওই প্রশিক্ষণ কালে খুবই কার্যকরী হয়।

এই ধরনের খেলা নির্ভর করে প্রশিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে চালিত করেন।

এই সংখ্যায় দুটি ছবি দেওয়া হল। দ্বিতীয়টি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিউম্যান ট্রলি বা হুইল ব্যারো প্রতিযোগিতা হতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি, একদল ফুটবল শিক্ষার্থী বাস্কেটবল খেলছে।

(চলবে)





এপ্রিলে কলকাতায় ফেডারেশন কাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেডারেশন কাপ ফুটবলের আগামী প্রতিযোগিতা যে কলকাতায় হবে তা প্রায় নিশ্চিত। উদ্যোক্তা আই এফ এ ইতিমধ্যেই নিখিল ভারত ফুটবল সংস্থার প্রয়োজনীয় সম্মতি আদায় করে নিয়েছেন। গত তিন বছরের ফেডারেশন কাপের আয়োজন থেকে এবারের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য আই এফ এ-র সম্পাদক অশোক ঘোষ প্রায় নিঃশব্দে সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখছেন। সম্ভবত আগামী এপ্রিলের ১৪ তারিখে এই প্রতি-যোগিতা শুরু হবে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে খেলা চলবে। প্রতিযোগিতার আনুমানিক ব্যয় হবে ৩০ লক্ষ টাকা। অনেক বেশী দর্শক যাতে খেলা দেখতে পারেন তার জন্য ইডেনে সব খেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আই এফ এ ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে সরকারের অনুমতি নিয়েছেন। আটান্তরের সন্তোষ ট্রফির মত সব টিকিটই সিজন করা হবে এবং টিকিটের দামও প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে।

ইউরোপিয়ান কাপ বা এশিয়ান কাপের ধাঁচে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন প্রবর্তিত ফেডারেশন কাপ ১৯৭৭ সালে শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে 'চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথম বছর কোচিনে অনুষ্ঠিত এই প্রতি-যোগিতায় অত্যধিক বৃষ্টির জন্য যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ওই বছর ফাইনালে মোহনবাগান প্রায় এক তরফা খেলেও ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজের কাছে ০—১ গোলে হেরে যায়।

১৯৭৮ সালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরপর দুদিন ফাইনালে খেলেও কোন গোল করতে না পারায় যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষিত হয়। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে জে সি টি/মোহনবাগান খেলাকে ঘিরে যে লজ্জাকর ঘটনা ঘটেছিল, ভারতের ফুটবলের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এ বছর এপ্রিল মাসে গোহাটি প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি নামকরা দল যোগ না দেওয়ায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেক কমে যায়। জলন্ধরের বর্ডার সিকিউ-রিটি ফোর্স বিজয়ী হয়। ফেডারেশন কাপ যে সময় হয়, দক্ষিণ ভারতের নামকরা প্রতি-যোগিতা যেমন কালিকটের শেঠ নাগজী, ব্যাঙ্গালোরের স্ট্যাফোর্ড কাপ, মাদ্রাজের ভিট্টল ট্রফি প্রভৃতি প্রায় একই সময়ে চলে। এর ফলে অনেক নামকরা দল ফেডারেশন কাপে খেলবার বিশেষ গরজ দেখায় না। সব নামকরা দল যোগদান না করলে ফেডারেশন কাপের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। তাই ভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার তারিখের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য অশোকবাবু ইতিমধ্যেই চেষ্টা করছেন।

কলকাতার তিন প্রধান ছাড়া পাঞ্জাবের জগৎজিত কটন মিলস, বি এস এফ ও পাঞ্জাব পুলিশ, গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব, কেরালার প্রিমিয়ার টায়ার্স, কেরালা রোড ট্রান্সপোর্ট (বা কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড), রাজস্থান পুলিশ, বোম্বাইয়ের মফৎলাল ওরকে মিলস ও টাটা স্পোর্টস ক্লাব, ব্যাঙ্গালোরের আই টি আই, আই সি এল, আসামের অয়েল ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজের সাদার্ন রেলওয়ে ইত্যাদির মধ্যে মোট ১৬টি দলকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

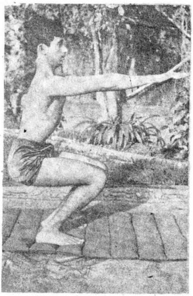
ফেডারেশন কাপের সঙ্গে সঙ্গে ১৪ বছরের ছেলেদের জন্য জাতীয় সাব-জুনিয়র প্রতি-যোগিতার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতাও চলবে। গত বছরের মীর ইকবাল ট্রফি বিজয়ী আসাম সহ প্রায় ১৫টি রাজ্যের ক্ষুদে খেলোয়াড়েরা এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে।

পুরস্কার বা স্কলারশিপ দেবার কথাও আই এফ এ কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন। সাব-জুনিয়র প্রতিযোগিতায় বয়স চুরি করে 'দাদারা' না ভিড়ে পড়ে—সে বিষয়ে নজর রাখা হবে।

৩.১২.৭৯

'উৎকটাসন'

মনতোষ চৌধুরী : করার পদ্ধতি : প্রথমে মেঝেতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার পা দুটো এমনভাবে ফাঁক করে দাঁড়ান যাতে একটা পা থেকে আর একটি পায়ের মাঝখানের দূরত্ব ৮ ইঞ্চির মত হয় এবং পায়ের পাতা দুটো যেন সমানভাবে থাকে। এবার হাত দুটো সোজা রেখে সামনের দিকে কাঁধ পর্যন্ত তুলুন। এ সময় একটি পা থেকে আর এক পায়ের মাঝখানের দূরত্ব যত থাকবে হাত দুটোর মাঝখানের দূরত্ব একটা থেকে আর একটির ঠিক ততটা থাকবে। হাতের তালু দুটো মাটির দিকে ফেরান থাকবে এবং মাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকবে। এবার সামনের দিকে না ঝুঁকে মেরুদণ্ড সোজা রেখে চেয়ারে বসার মত হাঁটু ভাঁজ করে নীচু করুন—যতক্ষণ না দু পায়ের উরু থেকে পাছা পর্যন্ত অংশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল না হয়। ওই সময় মাথা সোজা থাকবে। দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। এভাবে থাকার নাম উৎকটাসন।



আশা করি ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এভাবে দম স্বাভাবিক রেখে ৩০ সেকেণ্ড করে অভ্যাস করবেন। অভ্যাস করার পর অতি অবশ্যই শবাসন নেবেন। ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে ১ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস করতে পারবেন।

উপকারিতা : এ আসন অভ্যাসে হাঁটু এবং পায়ের জোর বাড়ে এবং হাঁটুর গ্রন্থিগুলিও শক্তিশালী হয়। হাঁটুর ব্যথা ও বাত সারে। সাধারণত মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর গ্রন্থি দুর্বল হয়ে যায়। তাতে তাদের চলাফেরা করা এবং ওপরে বেয়ে ওঠা ও সিঁড়ি ভাঙা খুবই কষ্টকর হয়। শরীরের ওজন নিজের পায়ের ওপর রাখা যায় না। এ আসন নিয়মিত অভ্যাসের ফলে হাঁটুর শক্তি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অটুট থাকে। ফলে শরীরের ওজন সম্পূর্ণভাবে পায়ের শক্তির আয়ত্তে থাকে। প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড়দের এ আসন বিশেষভাবে করা প্রয়োজন। তারা এ আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে পায়ের জোর বাড়বে এবং হাঁটুতে চোট লাগার ফলে ব্যথা হলে তাও সেরে যাবে।

অন্য চোখে

ব্যাসদেব ঃ ১৯৮০ কেমন যাবে এই নিয়ে গোটাকয়েক বই এই ১৯৭৯-তেই এখানে সেখানে দেখবার পর একটা নতুন প্ল্যান এসে গেল মাথায়। কলেজ স্ট্রিটের এক দু'দে প্রকাশকের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লুম তারপর। অনেকদিন আগে তিনি আমার একটা বই ছেপে কিছু কামিয়ে নেবার পর ডুব দিয়েছিলেন টাকা দেবার ভয়ে। সেই পুরনো কথার খেই ধরতেই তিনি না চেনার ভার্ন করলেন। তাকে আশ্বস্ত করে নতুন একটা বই-এর প্ল্যান বাতলাতেই তিনি চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন।

তাকে বললাম, দেখুন খেলাধূলায় সামনের বছরটা কেমন কাটবে তার ওপর একটা বই লিখতে চাই এবার। জ্যোতিষ নয়, নানান খেলার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেই ম্যানসাক্রিপ্টটা তৈরি করতে হবে।

প্রকাশক ভদ্রলোকের চোখজোড়া উত্তেজনায় চকচক করে উঠল একবার। আচমকাই তিনি বলে উঠলেন—হ্যাঁ, একবার লিখলেই হবে। বছরের পর বছর সেগুলোই উল্টেপাল্টে আমরা নতুন এডিশান বলে চালিয়ে যাব। তার ধান্দা শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলেও তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বললাম—এই সঙ্গে কলকাতার নামকরা ফুটবলারদের ঠিকুজি এবং হস্তরেখাও ছেপে দেওয়া যেতে পারে বই এর পেছনের দিকে। যাতে তাদের ফ্যানেরা নিজেদের ঠিকুজি আর হস্তরেখা মিলিয়ে নিতে পারেন।

দারুণ উত্তেজনায় প্রকাশক ভদ্রলোকের চোখ দুটো বারকয়েক ঘুরে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে বেরিয়ে এসে সোজা চলে গেলুম প্রদীপ ব্যানার্জির অফিসে। অনেকক্ষণ ধরে খেজুরে আলাপের পর তাকে সামনের বছরের কথা জিজ্ঞেস করতেই পি কে চুপ মেরে গেলেন। তাকে খোঁচানোর জন্য বললাম, সত্তরের দশকে প্রায় সবটাই আপনি যখন যেখানে থেকেছেন তাদের কেউ আটকাতে পারেনি। ১০৮০-তেও আপনি যেখানে থাকবেন তাদের কেউ আটকাতে পারবে না, এটা এখনই লিখে দিতে চাই আর কি।

পত্রপাঠ পি কে মুখ খুললেন। 'মানে আমি মোহনবাগান ছাড়ছি কিনা সেটাই জানতে এসেছেন, তাই না? এখনই বলছি, না।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবারের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা অনেক ঘুরঘুর করেও সেটা জানার মত লোক ক্লাব টেন্টে একজনকেও পেলাম না। কাঠের বেড়ায় কারা খড়ি দিয়ে অরুণ ঘোষ নিরুদ্দেশ লিখে রেখেছে দেখে সেটাই মনযোগ দিয়ে পড়ছিলুম, একটা হোঁৎকা চেহারার লোক কোথা থেকে এসে তার তলায় খড়ি দিয়ে লিখে গেল 'সন্ধান চাই না।'

মহমেডানের কোচ অমল দত্তকে পেলাম তার উত্তর কলকাতার বাড়িতে। অফ-সিজনে এই হামলায় তিনি আদৌ খুশী হননি সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। তাকে মহমেডানের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি তেড়িয়া হয়ে উঠলেন। আমি কোচ থাকব কিনা তারই ঠিক নেই, আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন সামনের বছর কি হবে। সিজনের মাঝখানে তিনি অন্য কোনো বড় দলের দায়িত্ব নেবেন কিনা এটা জিজ্ঞেস করতেই অমল দত্ত কটমট করে তাকাতেই আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে।

বি এইচ এ-র এক কর্মকর্তাকে ধরে হকি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি সরে পড়তে চাইলেন। তাকে ধাওয়া করে জানতে চাইলাম ১৯৮০-তেও হকি লিগ শেষ হয়ে যাবার তিন মাস পর কে চ্যাম্পিয়ন তা জানা যাবে কিনা। তিনি এটার উত্তর না দিলেও দারুণ একটা খবর দিয়ে দিলেন সামনের বছরের জন্য। ওয়ার্ল্ডে আমরাই প্রথম ফ্লাড লাইট হকি চালু করছি। রেনে ফ্রাঙ্কের সব খেলাই মোহনবাগান মাঠে ফ্লাডলাইটে হবে। ব্যাগ হাতে বিড়বিড় করতে করতে তিনি যেদিকে গেলেন, আমি তার উল্টোদিকে হাঁটা দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

ক্রিকেটে আমাদের হাল আরও খারাপ হয়ে যাবে কিনা সি এ বি-র একজন সিনিয়র সিলেক্টরের কাছে গিয়ে সেটা জানতে চাওয়ায় তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে যা ব্যক্ত করলেন তার মর্মার্থ হল সেটা এমন কিছু ভাবনার ব্যাপার নয়। টেস্ট ম্যাচ রয়েছে সামনে, সেটাই হল আসল মজা। লিগ, নক আউট, জে সি মুখার্জি ট্রফি যাতেই মোহনবাগান ঃ ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হোক না কেন স্কোর-বুক লোপাট বা ক্লাব হাউস ভাঙচুর এসব হবে কিনা ওই দুটো ক্লাবের ক্রিকেট সেক্রেটারিকে সেকথা জিজ্ঞেস করতেই তারা জানালেন, খেলা কোন্ দিকে যাবে তার ওপরই এটা ডিপেণ্ড করছে।



বলেছিলাম

মুস্তাফা নাশাদ



দাদা বল্ল ঃ বেকুব, গাধা !
কেন জানিস ? বলব রাধা ?
ক্রিকেট আমি বুঝি না যে
বুঝতে গেলে লাগে ধাঁধা !

উইকেটেতে থাকে বেল !
কাঁচা-পাকা-আর অঢেল ?
পড়লে কাকে খায় না কেন ?
জবাব দিতে সবাই ফেল !

খেলতে গেলে লাগে প্যাড !
দাদাটা বুঝি হল ম্যাড ?
গল্প-ছড়া লেখার খাতা
খেলবে নিয়ে ভেরি ব্যাড।

দিদিটা শুধু করে চুগলি !
মাঠে নিয়ে কেমন ভুগলি ?
দোষ বলতে বলেছিলাম
হাঁসেরা খায় গেঁড়ি-গুগলি !

বাঁকুড়ার জেলা ফুটবল জয়, অতঃ কিম্

অমল ত্রিবেদী ঃ জেলা ফুটবলে এই প্রথমবার বাঁকুড়া জেলা বিজয়ী হয়েছে। এর আগে মোট দুবার এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে। '৭৩ সালে সব খেলাগুলি হয় ও ৭৫ সালে একটি বিভাগ ও একটি সেমিফাইনাল খেলা হয়েছিল এখানে। এবারের উদ্যোগ আয়োজন অন্যান্য বারের অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

বাঁকুড়ার দর্শকদের আচরণ অনেককে মুগ্ধ করেছে। মারাত্মক গরমের মধ্যেও ২ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি খেলায় দুপুর থেকে দূর-দূরান্তের দর্শকেরা এসে ভিড় জমিয়েছিলেন কাউন্টার ও গেটের সামনে। স্টেডিয়ামে দর্শকাসন মেরে কেটে সাত-আট হাজারের বেশি হবে না, সেক্ষেত্রে প্রতি খেলাতেই অতিরিক্ত দর্শক দর্শনী দিয়ে মাঠে ঢুকেছেন। ফাইনালের ভিড় সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। সেদিন মাঠে দর্শক ছিলেন বারো হাজারেরও বেশি। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এদিন টিকিটের হার ছিল দ্বিগুণ, তা সত্ত্বেও বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে যান। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা স্থানাভাবে আর টিকিট বিক্রি করতে ভরসা পাননি।

উদ্যোক্তারা মাঠের দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আর একটু নজর দিলে ভাল করতেন।

প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ জেলা ক্রীড়া ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিদের উদাসীন ভাব বড় বেশি চোখে পড়েছে। এই সংস্থার কর্মকর্তারা বাঁকুড়ায় খেলা চলাকালীন ছিলেন না। প্রথম দিন এসেছিলেন কয়েকজন ও ফাইনালের দিন খেলা শুরুর আগে তাদের দেখা গেছে মাঠে। সমস্ত রকম দায়-দায়িত্ব জেলা সংস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে তারা ছিলেন নিশ্চিন্ত। ডবলিউ বি ডি এস এফ খেলায় পোস্টিং করে। এবার মাঝে মধ্যে দেখা গেছে পোস্টিং ঠিকমত হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয়েছে। বর্ধমানের যে ভদ্রলোক পোস্টিং করেন তার কাছে লোক পাঠিয়েও সুরাহা হয়নি। তবে ফাইনালে বাঁকুড়ার একজন লাইন্সম্যান পোস্টিং না করলেই ভাল করতেন উদ্যোক্তারা। বাঁকুড়ার মাঠে বাঁকুড়ার খেলায় স্থানীয় লাইন্সম্যান অনেকের মনঃপুত হয়নি।

স্থানীয় দর্শকেরা ভাল খেললে বাইরের দলগুলিকেও সমর্থন জানিয়েছেন। বাঁকুড়ার খেলোয়াড়দের সামান্য ত্রুটিতে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে। বাঁকুড়ার দর্শকেরা খেলা বোঝেন না এ পুরানো প্রবাদ শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না আর। ফাইনালে ন্যূনতম গোলে বাঁকুড়া চন্দননগরকে পরাজিত করলে খেলা শেষে মাঠ ও সমগ্র শহরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পটকা ও কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ও গগনভেদী চিৎকার অন্য সব উচ্ছ্বাসকে হার মানিয়েছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় মিষ্টি বিতরণ হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থা যেমন লায়নস ক্লাব, পুরসভা বাঁকুড়াকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। বিজয়ী দলকে ট্রফি সহ শহর ঘোরানো হয়েছে। তালে তালে বেজেছে ব্যাণ্ড ও তাসা। সব উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসবে একদিন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এখন থেকে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। তাদের সংস্থার আর্থিক অবস্থা এখন মোটামুটি স্বচ্ছল। ফলে একজন ভাল কোচ আনিয়ে জেলার ছেলেদের কোচিং দেওয়ার ব্যাপারটা তারা একটু তাড়াতাড়ি ভেবে দেখবেন কি? কারণ জেলার ফুটবলারদের মনোবল এখন তুঙ্গে। দরকার জেলা সংস্থার উপযুক্ত পরিকল্পনা।



পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / শংকর

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে যাদবপুর পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ নভেম্বর যাদবপুর বিদ্যালয়ের উদ্যোগে পূর্বাঞ্চল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল যে বিপুল উৎসাহ, উত্তেজনা ও বর্ণাঢ্য পরিবেশের মধ্যে শুরু হয়েছিল তা শেষ হল খেলোয়াড়দের হাতাহাতি বাক-বিতণ্ডা ও অবশেষে পুলিশের মৃদু লাঠি চালনার মধ্য দিয়ে।

২২ তারিখ পর্যন্ত নক আউট প্রথায় কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা শেষ হওয়ার পর ২৩ তারিখ থেকে শুরু হয় লিগ প্রথায় সেমি-ফাইনাল ম্যাচ।

সেমি-ফাইনালের প্রথম দিনের প্লে—অফ ম্যাচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫-০ গোলে রবীন্দ্র ভারতীকে এবং অপর খেলায় যাদবপুর ১-০ গোলে রাঁচীকে হারায়।

কলকাতা রবীন্দ্র ভারতীর বিপক্ষে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে জয়ী হলেও সিতাংশু কর্মকারকে দিয়ে হ্যাটট্রিক করাতে গিয়ে কলকাতা প্রায় এক ডজন গোলের সুযোগ নষ্ট করে। কলকাতার পক্ষে সিতাংশু কর্মকার হ্যাটট্রিক করেন। বাকি গোল দুটো করেন রানা দাশগুপ্ত।

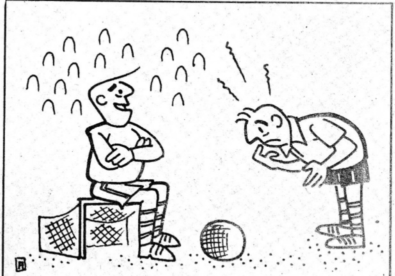
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাঁচীর প্রাধান্য সত্ত্বেও জয়ী হয়েছে প্রধানত রাঁচীর রক্ষণভাগের ভুলের জন্য। যাদবপুরের পক্ষে একমাত্র গোল পান কুণাল রতন দে।

পূর্বাঞ্চলীয় এই বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন সকাল ও বিকালে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। তবে কলকাতা ও যাদবপুরের খেলাতে রেকর্ড ভিড় হয়।

যাদবপুর প্রথমার্ধের বাইশ ও তিরিশ মিনিটে করা গোলে (২-০) কলকাতার বিপক্ষে জয় পেয়েছে। যাদবপুরের রাইটব্যাক বিজয় ভগতের সেন্টার থেকে বল পেয়ে লেফট স্ট্রাইকার বিশ্বদীপ (রাজা) চক্রবর্তী প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয় গোল পান বিজয় ভগত। দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা প্রায় সারাক্ষণই যাদবপুরের পেনাল্টি সীমানায় খেলেছে। দ্বিতীয়ার্ধের আঠার মিনিটের মধ্যে কলকাতা ছটা কর্নার কিক আদায় করে। তবু যাদবপুরের গোলরক্ষক অমল ঘোষের তৎপরতায় এবং প্রতিকূল ভাগ্য কলকাতাকে গোল থেকে বিমুখ করে। এক কথায় দ্বিতীয়ার্ধের খেলা হয় কলকাতা বনাম যাদবপুর গোলরক্ষক অমল ঘোষ। যাদবপুর পাঁচ ব্যাকে খেলে রক্ষণভাগ জোরদার করে।

রবীন্দ্র ভারতী ১-০ গোলে রাঁচীকে হারায়। রাঁচী কলকাতার বিরুদ্ধে তাদের শেষ খেলায় নাম প্রত্যাহার করার ফলে রাঁচীর বিরুদ্ধে কলকাতা ওয়াকওভার পেয়েছে।

সেমিফাইনালে লিগের শেষ ম্যাচটি রবিবার ২৫ নভেম্বর প্রথমার্ধের তিরিশ মিনিটের সময় বন্ধ হয়ে যায়। যাদবপুরের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় অমিত চ্যাটার্জি রবীন্দ্র ভারতীর ডি সাহাকে ট্যাকল করায় ডি সাহা পড়ে যান এবং উঠেই বিপক্ষ খেলোয়াড়ের দিকে ছুটে যান, ইতিমধ্যে সাইড লাইনের ধারে বসা যাদবপুরের এক খেলোয়াড় উত্তেজিত হয়ে মাঠে ঢুকে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ঘুষি মারে। এতে দর্শকরা উত্তেজিত ও মারমুখী হয়ে যাদবপুরের খেলোয়াড়দের দিকে ধাবিত হয়। ইতিমধ্যে যাদবপুরের খেলোয়াড়দের ক্যাম্প বিল্ডিং থেকে চেয়ার ছুঁড়লে ঘটনা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে ঘটনা আয়ত্বে আসে। রেফারি পশুপতি চৌধুরী পঁয়ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেন। এই সময় খেলা গোলশূন্য ছিল। এই ঘটনার পর স্পোর্টস বোর্ড এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পরের দিন (২৬ নভেম্বর) পুনরায় খেলার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রবীন্দ্র ভারতী তাদের খেলোয়াড়দের চোট ও অন্যান্য কারণে পুনরায় এই ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করে রবিবারই ক্যাম্প ত্যাগ করে। ফলে যাদবপুর ওয়াকওভার পায়।



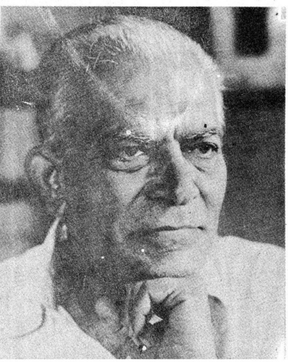
কার্টুন ঃ আলি

ময়দানের সুখী মানুষ,আদর্শ পুরুষ পরিতোষ চক্রবর্তী

সন্দীপ দত্ত ঃ কলকাতার মাঠে এই শতকের সেরা ডিফেণ্ডার কে ? এই প্রশ্নটির উত্তর এককথায় দেওয়া অসম্ভব। তবে কোনরকম যুক্তি-তর্কের মধ্যে না গিয়ে কয়েকজন 'সেরা ডিফেণ্ডার' বেছে নেওয়া যেতে পারে অবশ্যই। আর এই সমস্ত 'সেরাদের' মধ্যে চল্লিশ দশকের দুর্ভেদ্য ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্তী যে অন্যতম ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর একথাও নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না যে সে সময় পরিতোষ চক্রবর্তীকে বাদ দিয়ে ভারতীয় দল গড়ার কথা চিন্তাও করা যেত না। যদিও সবরকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরিতোষ চক্রবর্তী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সুবিচার পাননি। কারণ দৃঢ়চেতা এই খেলোয়াড় কোনও দিনই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে পারেননি। যার ফলে তাকে নোংরা ময়দানী রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে। এমনকি দলের আর সকলের ব্যর্থতাকে চাপা দিয়ে 'ঘুষখোর' এই অপবাদ দিয়ে দমিয়ে দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে। যা আজ-কালকার দিনে চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু এতসব করেও এই তেজি খেলোয়াড়টিকে সাময়িক অপদস্থ করা ছাড়া বিশেষ কোনও সুবিধে হয়নি। বরং পরিতোষ চক্রবর্তী আদর্শের পথকে আঁকড়ে থেকে মাথা উঁচু করে খেলে গেছেন সুনামের সঙ্গেই।

অন্তত কালিঘাট, ইস্টবেঙ্গল, বাংলা এবং ভারতের জামা গায়ে দিয়ে ঘরে ও বাইরের মাঠে দীর্ঘসময় ধরে একই ফরমে চুটিয়ে খেলে সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি। অবশ্য খেলোয়াড়ী জীবনের সেরা সময়টা তার কেটেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নাম লেখাবার পরেই তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুঙ্গে উঠেছিলেন।

এক সকালে বৈষ্ণবঘাটার বাড়িতে হাজির হয়ে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানাতেই মৃদু হাসলেন দীর্ঘকায় মানুষটি। এবং দেয়াল আলমারি থেকে দুটি লম্বা বাঁধানো খাতা টেনে নিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে বসে অল্পসময়ের মধ্যেই পিছনে ফেলে আসা খেলোয়াড় জীবনে হারিয়ে গেলেন। খাতা দুটির একটিতে সে সময়কার কিছু পেপার কাটিংস



পরিতোষ চক্রবর্তী / শঙ্কর নাগ দাস

সযত্নে সাঁটা রয়েছে। অন্যটিতে আত্মজীবনী। সম্ভবত কেউ লিখতে বলেছিলেন। কিছুদূর এগিয়েই থেমে গেছে কোনও কারণে।

আজ থেকে ৬২ বছর আগে ঢাকুরিয়ার একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন পরিতোষ চক্রবর্তী। বাবা নীলমাধব চক্রবর্তী ছিলেন ডাক ও তার বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। পরিবারের আর সকলের মত সপ্তম সন্তান পরিতোষকেও ছোট থেকেই কড়া নিয়ম মেনে চলতে হত। বাবার তৈরি দৈনিক রুটিনের মধ্যে বিকেলে মাঠে খেলতে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক।

দাদা শিশির চক্রবর্তীর হাত ধরে রোজ মাঠে ফুটবল খেলতে যেতেন বাচ্চা পরিতোষ। প্রসঙ্গত বলা দরকার, তিরিশের দশকে এরিয়ানের নামী ফুটবলার ছিলেন শিশির চক্রবর্তী।

ফুটবলার পরিতোষকেও তিনি তৈরি করেছিলেন নিজের হাতে। শীতের সময় চলত অ্যাথলেটিক্স চর্চা। ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই খেলাধূলায় চৌকশ হয়ে উঠলেন। পড়াশোনাতেও পিছিয়ে ছিলেন না বলে জগবন্ধু স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই প্রিয় ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় একবার বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। তখন পরিতোষ উঁচু ক্লাশের ছাত্র। তখনই তার উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। নিজের উচ্চতার পুরো সুযোগ নিয়ে স্পোর্টসের জাম্পিং ইভেণ্টের প্রাইজগুলিও বাঁধা ছিল। সেবার স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে হাই জাম্প দিলেন ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ক্লাসের ছাত্ররা যখন বন্ধুর কৃতিত্বে হৈ চৈ করছে ঠিক সেই সময় গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন হেডমাস্টার উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। 'পরিতোষ তোমার এত সাহস কি করে হল ?' ছোটখাটো চেহারার প্রধান শিক্ষক মশাই ছিলেন দারুণ রগুড়ে লোক। কিন্তু ছাত্ররা তার গম্ভীর মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল। 'তোমার এত সাহস যে তুমি আমার মাথা টপকে লাফ দিয়েছ ?' বলেই জড়িয়ে ধরলেন পরিতোষকে। তখন পরিবেশ ভুলে সকলেই হেসে ফেলল জোর গলায়।' প্রধানত হেড স্যারের উৎসাহেই জগবন্ধু স্কুল প্রথম বছরেই বঙ্কিম কাপ জিতেছিল পরিতোষের গোলে মিত্র ইনস্টিটিউশনকে হারিয়ে। ভাল খেলোয়াড় হিসেবে ঢাকুরিয়া ও কাছে পিঠের সকলেই তাকে চিনত। কিন্তু বাবার কড়া আদেশ ছিল ম্যাট্রিক পাস করার আগে কোনও ক্লাবের হয়ে খেলা চলবে না। বাবার আদেশ অমান্য করার সাহস বাড়ির কারও ছিল না। তা না হলে হয়ত অনেক আগেই ফুটবলার পরিতোষের খেলোয়াড় জীবনের সঙ্গে আরও কয়েকটা বছর যোগ হত।

যাই হোক, ১৯৩৬ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করতেই দাদা শিশির চক্রবর্তী নিয়ে এলেন খেলোয়াড় তৈরির কারখানা এরিয়ানে। সেখানে প্র্যাকটিসে ভাল ফল করলেও লিগের প্রথম তিনটি ম্যাচে লাইনের বাইরে বসে থাকতে হল পরিতোষকে। চতুর্থ ম্যাচ থেকেই এরিয়ানের দু'দে ডিফেণ্ডার ছোনে মজুমদারের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী মহমেডানের বিপক্ষে দারুণ খেলে দলে জায়গা পাকা করে নিলেন। তার পরের দুবছরের মধ্যেই এরিয়ানে কাটাবার ফাঁকে ফাঁকে একজন ভাল ডিফে-ণ্ডারের প্রয়োজনীয় গুণগুলি ভালরকম আয়ত্ত করে উঠতি ডিফেণ্ডার হিসেবে পরিচিত হয়ে গেলেন। ১৯৩৯ সালে দলবদল শুরু হতেই মোহন-বাগান ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক গগন ঘোষ ঝটপট পরিতোষকে দলে টেনে নেন। সেবছর মোহনবাগান একজন টগবগে ডিপ ডিফেণ্ডার খুঁজছিল 'অভিজ্ঞ সন্মথ দত্তর জুড়ি হিসেবে। এরিয়ানের এই বাচ্চা ছেলেটির দাপট গগন ঘোষকে মুগ্ধ করেছিল। ফলে গগন ঘোষ আশাবাদী ছিলেন পরিতোষের ভবিষ্যত সম্পর্কে। অবশ্য একই পজিসনে খেলার জন্য আরও অনেক নতুন খেলোয়াড়কেও নেওয়া হয়েছিল। প্র্যাকটিসে সবাইকে ছাপিয়ে পরিতোষই সকলের নজর কেড়ে নিল। কিন্তু ওই

রোগা শরীরে বড় ম্যাচের ধকল সামাল দিতে পারবে কিনা এই নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এমনকি 'চীনের প্রাচীর' গোষ্ঠ পালের মুখ থেকেও একই কথা শোনা গিয়েছিল—'ওই তালপাতার সিপাই দিয়া আর যাই হউক না ক্যান ব্যাকে খেলা চলবো না'। লিগ শুরুর আগে মোহনবাগান সেদিন শক্তিশালী সামরিক দল ব্ল্যাকওয়াচের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের দলগত শক্তি পরখ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষেরও যোগ্যতার পরীক্ষা করা।

ছোট থেকেই বাড়ির কড়া শাসনে বেড়ে ওঠা পরিতোষের শিশু মনের ওপর দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী মা পূর্ণশশীদেবীর প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল। যার ফলে খুব অল্প বয়সেই পরিতোষের মনের জোর ছিল অসাধারণ। নানাক্ষেত্রে তার সেই মনের জোরের পরিচয় মিলেছে দীর্ঘ খেলোয়াড় জীবনে। সেদিন খেলতে যাওয়ার মুখে গোষ্ঠ পালের মন্তব্য পরিতোষের জেদকে উস্কে দিল। সেদিন খেলার শেষে তাঁবুতে ফিরতেই গোষ্ঠ পাল তার বিরাট বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন পরিতোষকে। একে বড় ক্লাব, তার ওপর মোহনবাগানের জার্সি পরে প্রথম ম্যাচেই গোরাদের সমীহ আদায় করে তাঁবুতে ফিরেছিলেন পরিতোষ। উল্লেখ্য, সেবছরই মোহনবাগান প্রথম লিগ পায়। টানা ২৪ বছর পর অবশ্য শিল্ডের প্রথম খেলাতেই এরিয়ানের কাছে ১-০ হেরে মোহনবাগান জয়ের পথ থেকে ছিটকে পড়ল।

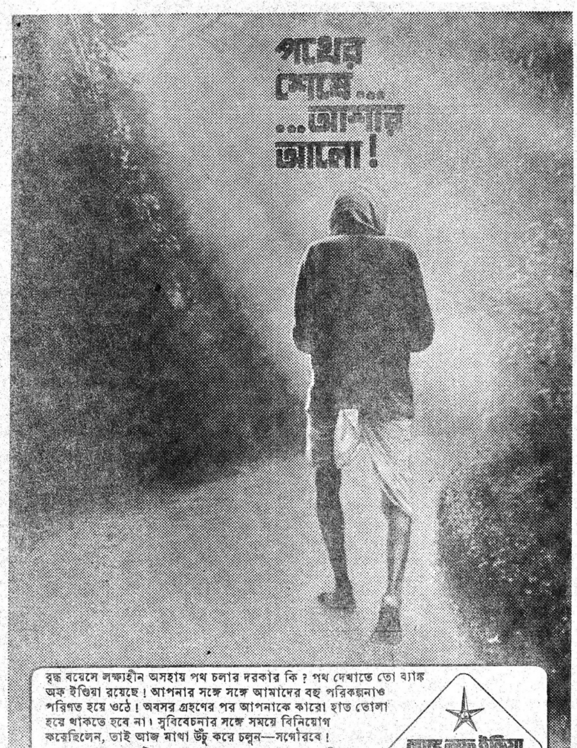
এক বছরের মধ্যেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও ফুটবল রসিকদের আস্থা অর্জন করে পরিতোষ অনেক এগিয়ে গেলেন। খেলার মাঠে দর্শকদের খুশী করলেও বঙ্গবাসী কলেজের এই ছাত্রটি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষককে কিন্তু খুশী করতে পারেননি। পরীক্ষায় ফেল করলেন। অবশ্য সে সময় সংসারের প্রয়োজনেএকটা চাকরি জোগাড়ের চিন্তা পরিতোষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তবু তার মধ্যেই তিনি কলেজের ফুটবল অধিনায়ক হিসেবেও নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যথাযথভাবে। বঙ্গবাসী কলেজ সেবছর ইউনিভার্সিটি লিগ, হার্ডিঞ্জ বার্থডে শিল্ড এবং মালদায় হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড জিতেছিল।

১৯৪০ সালে লিগে মোহনবাগানের দুই খেলোয়াড় কালীকৃষ্ণ দত্ত (কে দত্ত) ও পরিতোষ চক্রবর্তী একটানা দারুণ ভালো খেললেন। তাই সকলেরই ধারণা ছিল পরিতোষ ও কে দত্ত—দুজনেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। কিন্তু দল গঠনের সময় অজ্ঞাত কারণে পরিতোষ চক্রবর্তীর নাম বাদ গেল। তখন সমস্ত পত্রপত্রিকা নির্বাচকদের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। প্রখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক ও সাংবাদিক পঙ্কজ গুপ্তর কলম ঝলসে উঠল অমৃতবাজারের পাতায়—'পরিতোষ চক্রবর্তীকে ছাড়া কোনও ভারতীয় দল গড়া আর ডেনমার্কের রাজকুমারের চরিত্রটি বাদ দিয়ে 'হ্যামলেট' নাটক মঞ্চস্থ করা একই ব্যাপার।' অবশ্য নির্বাচিতদের তালিকা শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিতই ছিল।

খেলার মাঠে বিপক্ষ ফরোয়ার্ডদের কেরামতি স্তব্ধ করায় কুশলী পরিতোষের কাছে এধরনের অভিজ্ঞতা একদমই নতুন। অবশ্য ভারতীয় দলে খেলতে না পারার জন্য ক্ষোভ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সাফল্যের পথ বেয়ে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া পরিতোষকে থামিয়ে দিতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন এমন কিছু স্বার্থান্বেষী লোক—যারা চিরকালই ময়দানের স্বাস্থ্যকর পরিবেশকে নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে কলুষিত করে থাকেন।

সেবছর আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে উঠল মোহনবাগান ও এরিয়ান। যে কোন সময়ই ময়দানের বড় দরের ক্লাবগুলিকে ঘায়েল করার সুনাম এরিয়ানের আছে। সেই হিসেবে সব ক্লাবই এরিয়ানকে সমীহ করে চলত। কিন্তু ফাইনাল খেলার দিন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সন্মথ দত্তর বদলে জুনিয়র প্লেয়ার তারক চৌধুরীকে সঙ্গী করে খেলতে বলা হল পরিতোষকে। গোড়া থেকেই এরিয়ানের ঘনঘন আক্রমণের ঝাপটার মুখে পায়ে দারুণ চোট নিয়েও সেদিন বাঘের বিক্রমে লড়াই করেছিলেন পরিতোষ। হাফটাইমে খেলার ফল ১-১ (প্রথম এরিয়ানের ডি ব্যানার্জির দেওয়া গোল সঙ্গে সঙ্গে শোধ দিয়েছেন মানা গুঁই)। কিন্তু বিরতির পর এরিয়ান অপ্রত্যাশিত ভাল খেলে ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের আশায় বাদ সাধল। আসলে এরিয়ানের ছক বাঁধা পরিচ্ছন্ন ফুটবলের সামনে মোহনবাগানের গোটা দলটাই বেসামাল হয়ে পড়েছিল। একা পরিতোষই কিছুটা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খেলার শেষে গোটা দলের ব্যর্থতা (বিশেষ করে ফরোয়ার্ডদের) ঢাকতে চাউর হয়ে গেল কে দত্ত ও পরিতোষ চক্রবর্তী ঘুষ খেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রিয় দল বিশ্রীভাবে হেরে যাওয়াতে সকলেরই মাথা গরম ছিল। এ ধরনের খবরে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। উত্তেজনার বশে সমস্ত বোধবুদ্ধি হারিয়ে কর্মকর্তারাও সত্যি-মিথ্যে যাচাই না করেই কে দত্ত এবং পরিতোষ চক্রবর্তীকে দোষী সাব্যস্ত করে বসলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় অভিযুক্ত দু'জনেই হতবাক হয়ে গেলেন। চরম অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ফিরলেন সেদিন পরিতোষ। অবাক কাণ্ড, যোগ্যতা দেখিয়ে শিল্ড জয়ী এরিয়ানের কৃতিত্বকেও খাটো করতে বাধেনি সেই কর্মকর্তাদের। এবং সমর্থকরা পুরো আক্রোশের জ্বালা মেটাল পরিতোষ ও কে দত্তর ওপর। বড় হয়ে ওঠার মুখে মনের ওপর এই ধরনের আঘাতে যে কোনও খেলোয়াড়ই সাধারণত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই পরিতোষও মানসিক দিক থেকে প্রচণ্ড রকম ভেঙ্গে পড়লেন। এমনকি এক সময় মাঠের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন বলেও ঠিক করলেন। কিন্তু মা পূর্ণশশী দেবীর কথায় সমস্ত চিন্তাধারা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। 'অন্যায়কে সহ্য করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকা পৌরুষের লক্ষণ নয়'। মায়ের এই কটি কথা পরিতোষের হতাশায় ঘুমিয়ে পড়া ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে দিল; খেলার মাঠেই এই অপমানের যোগ্য জবাব দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে আবার মাঠে ফিরে এলেন পরিতোষ। পরের বার পুরোন তাঁবু পাল্টে কালিঘাট ক্লাবে নাম লেখালেন। সেই চরম মুহূর্তে পরিতোষকে উৎসাহ দিয়ে চাঙ্গা করে না তুললে হয়ত চল্লিশের দশকের এই ডাকসাইটে ডিফেণ্ডার চিরদিনের মত হারিয়েই যেতেন।

এরপর পরিতোষ সাফল্য কুড়িয়েছেন একের পর এক। ১৯৪১ লিগেই কালিঘাটের কাছে মোহনবাগান পয়েণ্ট খোয়াল মূলত সে বছরই দলছুট হয়ে যাওয়া দুই খেলোয়াড় পরিতোষ ও মোহিনী ব্যানার্জির দৃঢ়তায়। একই বছরে সিনিয়র ইণ্টারন্যাশনাল, সর্বভারতীয় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে হিন্দু দলের হয়ে খেলা ছাড়াও প্রথম বছরেই পাটনায় অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের এই ডিফেণ্ডার সকলের প্রশংসা নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। অবশ্য বাংলা দলে পরিতোষের নির্বাচন নিয়ে অনেকেই বাগড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি। কথা প্রসঙ্গে সেবারের একটি মজার ঘটনা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন পরিতোষ চক্রবর্তী। সে সময় যিনি কোচবিহারের মহারাজা ছিলেন, তিনি খেলাধূলা ভীষণ ভালবাসতেন। কালিঘাট ক্লাব থেকে কয়েকজন খেলোয়াড় মহারাজার ডাকে কোচবিহার খেলতে গিয়েছিলেন। পরিতোষ চক্রবর্তী, মোহিনী ব্যানার্জির সঙ্গে গোলকিপার হিসেবে গিয়েছিলেন পিয়ারসন সুরিটা (পরবর্তীকালে যিনি বিখ্যাত ধারাভাষ্যকার হিসেবে খ্যাত হন)। হুল্লোড়বাজ পিয়ারসন ছিলেন দারুণ হুজুগে ধরনের। খেলার দিন সকালে হঠাৎ পিয়ারসনের মাথায় ঢুকল বাঘ শিকারে যাবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কাছাকাছি গ্রামে একটি বাঘ তখন প্রচণ্ড দৌরাত্ম চালাচ্ছিল। অতএব দল বেঁধে হাতীর পিঠে চড়ে রাইফেল হাতে সেই গ্রামে হাজির হলেন সকলে। সৌভাগ্যক্রমে বাঘের দেখাও মিলল। কিন্তু গুলি ছুঁড়তেই বিপত্তি। রাইফেলের ধাক্কায় পিয়ারসন ধরাশায়ী হলেন।



daCunha-BOI-73 BN

পরমুহূর্তেই হাতীর ব্রেজ ধরে পিঠে চড়ার চেষ্টায় বিফল হয়ে 'হেল্প মি-হেল্প মি' বলে চেঁচাতে শুরু করলেন। গুলির আওয়াজে বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় বাঘটি যতনা বিরক্ত হয়েছিল, পিয়ারসনের বুকফাটা চিৎকারে তারচেয়েও বিরক্ত হয়ে পিঠটান দিল। অন্য সকলে এতে মজার খোরাক পেলেও এই ঘটনার স্মৃতি পিয়ারসনকে বহুদিন পর্যন্ত দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করেছে।

১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেবার পর থেকেই পরিতোষ খেলোয়াড় হিসেবে যথার্থ প্রতিষ্ঠা পান। অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের গৌরব অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল একই বছরে। এককথায় বলা যায় খেলোয়াড়ী জীবনের সেরা সময়টা পরিতোষ ইস্টবেঙ্গলেই কাটিয়েছেন। যোগদানের বছরেই ইস্টবেঙ্গল প্রথম লিগ জয় করে। শিল্ডে রানার্স হয়। এছাড়া ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ইস্টবেঙ্গল থেকে নির্বাচিত তিন খেলোয়াড়ের অন্যতম ছিলেন। পরের বছর লিগ ও শিল্ড দুটোতেই রানার্স হয় ইস্টবেঙ্গল। ১৯৪৫ সালটি নানা কারণে পরিতোষ চক্রবর্তীর কাছে স্মরণীয়।

সে বছর প্রথম দ্বিমুকুট অর্থাৎ লিগ ও শিল্ড পাওয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন পরিতোষ চক্রবর্তী। বিশেষ করে শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে পুরোন ('৪০ সালের) ঘটনার কথা তুলে পরিতোষকে খেলানো ঠিক হবে কিনা এ ব্যাপারে বেশকিছু কর্মকর্তা ভাবনা চিন্তা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন দলের তিন নিয়মিত খেলোয়াড় কে দত্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং রাখাল মজুমদারকে ছাড়া ইস্টবেঙ্গল দলকে মাঠে নামতে দেখে অতি বড় সমর্থকও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার পর তিন খেলোয়াড়ের অভাব পূরণ করতে একাই একশ ছিলেন পরিতোষ এবং শেষ পর্যন্ত পাগসলীর গোলে ইস্টবেঙ্গল শিল্ড জিতে নেয়। খেলার ধারা অনুযায়ী ব্যবধান আরও বড়সড় হওয়া উচিত ছিল। কারণ সেদিন ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের চাপে শৈলেন মান্না, শরৎ দাসের মত ডিফেণ্ডাররাও বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়কার ফুটবল লিখিয়েদের বিচারে মাঠের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন পরিতোষ চক্রবর্তী। সেবারে সন্তোষ ট্রফিতেও বাংলার জয়ে অধিনায়ক পরিতোষের অবদান ছিল বিরাট। এছাড়া ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধেও খেলেছেন সমান দাপটে। '৫০ সালে ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার আগে পর্যন্ত ক্লাবের সমস্ত সাফল্যেই সমান কৃতিত্বে দলের হয়ে লড়েছেন। এর মধ্যে '৪৯ সালে ইস্টবেঙ্গলের ত্রিমুকুট জয় অন্যতম ঘটনা। '৫০ থেকে '৫৩ সাল পর্যন্ত চাকরীসূত্রে কাস্টমসের হয়ে খেলার পর খেলা থেকে অবসর নেন এই দুর্ধর্ষ ডিফেণ্ডার। ফুটবলার পরিতোষের ভলিবল ও ক্রিকেটেও সমান দক্ষতা ছিল। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ক্রিকেটে তিন অঙ্কের রান করলেও ভলিবলে রাজ্য দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দু'হাতেই সমান জোরে স্ম্যাশ করতে পারতেন নিজের দৈহিক উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে। একবার ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক গেমসে পাতিয়ালার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পরিতোষের বাঁ-হাতি স্ম্যাশ ফার্স্ট কোর্টে দাঁড়ানো বিপক্ষ খেলোয়াড়ের মাথায় লাগতেই 'মরে গেলাম' বলে ঘুরে পড়ে গেল। অবশ্য পরে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

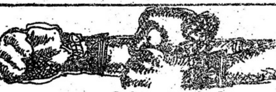
এক টানা ঘণ্টা দুয়েক কথা বলার পরও পরিতোষ চক্রবর্তীকে সমান সজীব দেখাচ্ছিল। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন চার বছর আগে। এই '৬২ বছর বয়সেও ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার সোজা সবল শরীরটা আজকালকার ফুটবলারদের লজ্জা দেবে। চলাফেরা এবং কথাবার্তায় যে কোনও তরুণ যুবকদের সঙ্গে কোনও ফারাক নেই। বিশেষ করে মায়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা তাকে জীবনে বড় হতে সাহায্য করেছে। এক কথায় মানুষ পরিতোষ চক্রবর্তী কোন্ ছোটবেলায় মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কোনও দিন মদ বা বিড়ি সিগারেট খাবেন না, আজও তাই মেনে চলেছেন।

১৯৫৮ সালে খেলা থেকে অবসর নিলেও ময়দানের মায়া কাটাতে পারেননি। ভেটারেন্স ক্লাবের জন্ম মুহূর্ত থেকে ক্লাবের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রোজ বিকেলে ময়দানে ভেটারেন্স ক্লাবের সম্পাদকের দায়িত্ব সারার ফাঁকে ফাঁকে পুরোন সমসাময়িক খেলোয়াড়দের সঙ্গে আড্ডা মারতে ভালবাসেন। এছাড়া মাঝে মধ্যে প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিতে যায় ভেটারেন্স ক্লাব। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরিতোষ চক্রবর্তী দলের সঙ্গে থাকেন। ফুটবলার তৈরির চিন্তায় মাথা ঘামালেও খেলা দেখতে যান না বললেই চলে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বললেন—এখনকার প্লেয়ারদের ক্লাবের প্রতি আন্তরিকতা কমে গেছে।

ময়দানী জীবনে মাঝে মাঝে দুঃখ পেলেও সাংসারিক জীবনে পরিতোষ চক্রবর্তী দারুণ সুখী। একমাত্র ছেলেকে ফুটবলার বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই চোখের অসুখের জন্য সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। সদা হাসিখুশি মানুষ পরিতোষ চক্রবর্তীর এজন্য কোনো দুঃখ নেই।

বল দেখি

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



১। সব থেকে বেশী দিন ঘুষোঘুষি বীর
পৃথিবীর সেরা সে যে উন্নত শির। কে?

২। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো
কোন পতাকার রঙগুলি ভালো?

৩। ইংলিশ চ্যানেলের পারে
প্রথম মহিলা দেয় সাঁতার। কে?

৪। লিণ্ডওয়াল সবে জানে
বল করে জোরে।
কতবার টেস্টম্যাচে
সেঞ্চুরি করে?

৫। আলফ্রেড ডি স্টিফানো,
সবাই জানে নাম।
কোথায় তাহার আদিবাস,
কোনখানে তার ধাম?

উত্তর ঃ ১। জো লুই (১১ বছর ৮ মাস ৭ দিন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ছিলেন)। ২। ওলিম্পিক পতাকা—পৃথিবীর সবদেশের পতাকাতেই এর একটি রঙ থাকে। ৩। Gertrude Eberle (গ্যারট্রুড এবারলি) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৬। ৪। দুবার—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে (মেলবোর্ন, ১৯৪৬-৪৭) ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে (ব্রিজটাউন, ১৯৫৪-৫৫)। ৫। আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় পরে স্পেনে খেলেন।

চন্দননগরে ফুটবল, পুলিস দলের সাফল্য



দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন চন্দননগরের শরৎ সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি জেলা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বার্নাড কাপ ও গ্লাডস্টোন কাপ দুটোই জিতে পুলিশ এ সি এবার উল্লেখযোগ্য নজির রেখেছে।

বার্নাড কাপ ফুটবল ফাইনালে পুলিশ এ সি ১-০ গোলে রাজেন্দ্র স্মৃতি সংঘকে হারিয়ে দেয়। জয়সূচক গোলটি দেন অসীম দাস। গ্লাডস্টোন কাপের খেলাতে পুলিস এ সি ফাইনালে ৭-০ গোলে চিনসুরা ইউনিয়ন (জুনিয়র)-কে হারিয়ে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে।

চন্দনগর ফুটবল লিগ : চন্দননগর সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লিগে এবার বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ও সি সি ক্লাব যুগ্মবিজয়ী হয়েছে। দুটি দলই এগারটি খেলায় সতের পয়েণ্ট পায়। লিগ তালিকার নিচের তিনটি দল ফ্রেণ্ডস ক্লাব, টাউন ক্লাব ও জুপিটর স্পোর্টিং দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গিয়েছে। আর শরৎ সংঘ দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর থেকে প্রথম ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে।

ফাইভ স্টারের জয় : উত্তর চন্দননগর অগ্রণী ক্লাব পরিচালিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ফাইভ স্টার দল ৫-১ গোলে কল্কি সংঘকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। বিজয়ী দলের তরুণ সাহা (২), প্রণবীর ঘোষাল (২), অসীম কর এবং বিজিত দলের সুরজিৎ নন্দী গোল দেন। পুরস্কার বিতরণ করেন ক্রীড়া সাংবাদিক অজয় বসু।

শরৎ সংঘ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন : চন্দননগর ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ডিভিসনের খেলায় শরৎ সংঘ সুপার লিগে পাঁচটি খেলায় পুরো দশ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। এর আগে লিগে তারা এগারটি খেলায় উনিশ পয়েণ্ট পেয়েছিল। লিগে আজাদ সংঘ এক পয়েণ্ট এগিয়ে থাকলেও সুপার লিগে শরৎ সংঘের কাছে ২—০ গোলে হেরে দু'পয়েণ্ট নষ্ট করে। ওরা হয় রানার্স।

শরৎ সংঘের এবার যারা খেলেন তারা হলেন : শঙ্কর শীল, প্রভাত ঘোষ, সুশান্ত দে, প্রশান্ত দে, সঞ্জয় দে, গোলক কর, অমিত নাগ, মৃনাল ভক্তা, সুব্রত ঘোষ, প্রদীপ সাহা, পীযুষ সাহা (অধিনায়ক), অনিল মাইতি, তুষার কর্মকার, তাপস পাল, কৃষ্ণ সুবুল, বিশ্বনাথ ঘোষ, তপন মজুমদার ও দীপঙ্কর কুণ্ড।

জুডো প্রতিযোগিতা : চুঁচুড়ায় এক জুডো প্রতিযোগিতায় পুলিসের সুবল দত্ত, বিমল ঘোষ ও সত্যেন সরকার বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী হন। দুই ছোট্ট প্রতিযোগী রবিশঙ্কর ঘোষ ও মণিশঙ্কর ঘোষের লড়াই দর্শকদের উৎসাহিত করে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের কয়েকজন প্রশিক্ষক ছুরি এবং পিস্তলধারীদের আক্রমণ রোখার কলাকৌশল দেখান।

সংক্ষেপে

চার মাইল সাঁতারে এবার চোদ্দ বছরের ছেলে মানস বসু প্রথম এবং দ্বিতীয় হয়েছেন সঞ্জয় ঘোষ। চাতরা সুইমিং ক্লাবের এই দুই সদস্যের সময় লাগে যথাক্রমে ৪৯ মিনিট ২৫.৫ সেকেণ্ড এবং ৫২ মিনিট। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন নালিকুল স্বামীজী সংঘের চন্দ্রকান্ত সাঁতরা। তার সময় ৫২ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ড।

প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল গৌরহাটি—চাঁপদানী থেকে। ওখান থেকে ৬ জন মেয়ে সমেত ৫৮ জন গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেন। তার মধ্যে দু'জন ছিলেন বিহারের প্রতিযোগী। কয়েকজন ছিলেন মেদিনীপুরের।

মানস অবশ্য সাঁতার শিখছেন মাত্র দু'বছর। যদিও তিনি বোম্বাইয়ে বয়স ভিত্তিক সাঁতারে অংশ নিয়েছিলেন, হুগলি জেলা সাঁতার প্রতিযোগিতায় একশো মিটার ফ্রি স্টাইল ও পঞ্চাশ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে প্রথম হন, কিন্তু দূরপাল্লার সাঁতারে কোনদিন নামেনি।

আন্তঃকলেজ কবাডিতে ট্রফি নিল দুর্গ বিজ্ঞান কলেজ

দুর্গ থেকে গাজি এম আনসার : এ বছরে রায়পুর রবিশঙ্কর ইউনিভার্সিটির আন্তঃকলেজ কবাডি প্রতিযোগিতা ধমতরী কলা ও বিজ্ঞান কলেজে হল।

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ২১টি কলেজ এখানে খেলতে আসে।

কোয়ার্টার ফাইনালে গভঃ কলেজ দুর্গ রায়পুরের দুর্গা কলেজকে হারায় এবং দ্বিতীয়টি-তে সি এম ডি কলেজ বিলাসপুরের ছেলেরা স্নাতক কলেজ বিলাসপুরকেই হারায়। অপর একটিতে ছত্তীশগড় রায়পুর কলেজ রায়পুরের ইউ টি ডি-কে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তেজনাময় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বালোদা বাজার গভঃ বিজ্ঞান কলেজ রায়পুরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে।

সেমিফাইনালে রায়পুর ছত্তীশগড় কলেজ বিলাসপুরের সি এম ডি কলেজকে এবং বিজ্ঞান কলেজ দুর্গ বালোদা বাজারকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

কয়েক হাজার দর্শকের উত্তেজনাকর চিৎকার আর হাততালির সোরগোল নিয়ে প্রথমার্ধে বিজ্ঞান কলেজ দুর্গ (১-০) পয়েণ্টে এগিয়ে যায় এবং দ্বিতীয়ার্ধে আরো তিনটি পয়েণ্ট যোগ করে অর্থাৎ (৪-১) পয়েণ্টে রায়পুরের ছত্তীশগড় কলেজকে হারিয়ে ইউনিভার্সিটির ট্রফি জেতে। ●



বিজয়ী দুর্গ বিজ্ঞান কলেজের ছাত্ররা

পাকিস্তানী ক্রিকেটের শিরোনাম

জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তানের প্রবেশ। ওদেশের বয়স নিতান্তই কম। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটে তার কৃতিত্ব কম নয়। এই স্বল্পকালে তাদের ক্রিকেট তারকার অনেকেই বিভিন্ন দেশে বন্দিত। 'পাকিস্তানী ক্রিকেটের শিরোনাম' পর্যায়ে অতীত তারকাদের সম্পর্কে এই ধারাবাহিক রচনা।

পাকিস্তানের ফ্রাঙ্ক ওরেল

সুব্রত সরকার ঃ মাত্র ১১টি টেস্টে এক হাজার রান। ভারতীয় আর পাকিস্তানী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সব থেকে দ্রুত টেস্ট ক্রিকেটে ১,০০০ রান করবার রেকর্ড এটিই। তবে ভারতের সুনীল গাভাসকর এমন কৃতিত্ব অর্জন করবার প্রায় ১৫ বছর আগে পাকিস্তানের পক্ষে এগারোটি টেস্টে হাজার রানের গণ্ডি পার হন সাঈদ আমেদ।

পাকিস্তান দলের ১৯৬০-৬১'র ভারত সফরের সময় তাদের নিয়মিত তিন নম্বর ব্যাটসম্যান ছিলেন সাঈদ। সেবারকার সিরিজে তিনি বোম্বাই আর মাদ্রাজ টেস্টে শতরান করেন। কলকাতায় তৃতীয় টেস্টের দুটি ইনিংসে সাঈদ করেন যথাক্রমে ৪১ আর ১৩—দুবারই সুরেন্দ্রনাথের সুইং বোলিং-এ আউট হন।

প্রথম পাকিস্তানী টেস্ট দলের সব থেকে স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান ছিলেন ওয়াকর হাসান। ওয়াকরের টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষাশেষি সাঈদ জাতীয় দলে স্থান পান। সাঈদের খেলার কায়দাও ছিল খুব সুন্দর। প্রধানত ড্রাইভের উপরে খেলতেন, তবে তার মারগুলিতে শিল্পীর ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট।

সাঈদ প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৫৭-৫৮-এর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। ক্যারিবিয়ানের দর্শকরা প্রতি সিরিজে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের চমৎকার ব্যাটিং দেখতে অভ্যস্ত। তবে সেবার ওরেল দেশে খেলতে ফেরেননি। ১৯৫৭ ইংল্যাণ্ড সফরের পর তিনি ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাঠে মাঠে সাঈদের ব্যাটিং-এর ভঙ্গি দেখে সে দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকরা সাঈদ আমেদকে পাকিস্তানের ফ্র্যাঙ্ক ওরেল বলে বর্ণনা করেন। সাঈদের খেলা এতই তাদের মুগ্ধ করেছিল।

সাঈদের জন্ম জলন্ধরে—১৯৩৭-এর ১ অক্টোবর। দেশ ভাগের সময় তাঁর বয়স বছর দশেক। সাঈদের বাবা কিন্তু সপরিবারে পাকিস্তান যান পার্টিশনের কয়েক বছর পরে। সাঈদের সৎ-ভাই ইউনিসের (পাকিস্তানের ন্যাটা ব্যাটসম্যান) জন্মও জলন্ধরে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী দলে যখন সাঈদ নির্বাচিত হন তখন তার বয়স সবে ২০ পূর্ণ হয়েছে। প্রথম সিরিজে পাঁচটি টেস্টে সাঈদ ৫০৮ রান করেন—তার মধ্যে সর্বোচ্চ জর্জটাউনে চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৫০।

টেস্টে সাঈদ আরও চারটি শতরান করেন—ভারত সফরে দুটি, বাকি দুটি দেশের মাটিতে। মোট ৪১টি টেস্ট খেলে তিনি

আগামী সপ্তাহে ঃ নসিম-উল-ঘানি।

করেন ২,৯৯১ রান (গড় ৪০.৪২)। ৭৮টি ইনিংসের মধ্যে ২১টিতে সাঈদ পঞ্চাশ রান পার হন।

সাঈদের টেস্ট জীবন শেষ হয় ১৯৭২-৭৩-র অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ে। সেবার মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টে সাঈদ সাদিক মহম্মদের সঙ্গে ব্যাটিং ওপেন করতে যান। প্রথম উইকেট জুটিতে তারা ১২৮ রান করেন। সাঈদ ৫০ রান করে আউট হন। তবে ব্যাট করবার সময়ে তার অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়।

লিলি নাকি বলেছিলেন, পরের টেস্টে দেখা যাবে। কিন্তু সিডনিতে তৃতীয় টেস্টের আগে সাঈদ দলের ম্যানেজারকে জানান, আমি ফিট নই, খেলতে পারব না। পাকিস্তান ক্রিকেটের এক মহলে রটে যায়, সাঈদ বুঝি ভয়ে খেলেননি। দলের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণের সুযোগ না দিয়ে সাঈদকে দেশে ফেরত আসতে বলা হয়। এমনভাবেই সাঈদের টেস্ট জীবনের সমাপ্তি।

সাঈদ একটি সিরিজের জন্য পাকিস্তানের অধিনায়কও ছিলেন। ১৯৬৯-এর প্রথম দিকে দেশে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজের জন্য সাঈদ ক্যাপ্টেন মনোনীত হন। তিনি লাহোরের প্লেয়ার, কারদার সাহেবের তিনি বিশেষ প্রিয় বলে পরিচিত। তবে করাচিতে হানিফ মহম্মদের হয়ে অনেকে বক্তব্য রাখেন। পরের সিরিজে ইন্তিখাব আলমকে অধিনায়ক করা হয়।

টেস্টে সাঈদের সেঞ্চুরিগুলির মধ্যে ১৯৫৯-এ লাহোরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬৬ উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২৪৫ রানে এগিয়ে থাকলে পাকিস্তানের দ্বিতীয় দফায় ৮৭ রানে দুটি উইকেট পড়ে যায়। ইনিংস পরাজয় অবধারিত। এই পরিস্থিতিতে সাঈদ ডেভিডসন বেনোর মতন বোলারদের বিপক্ষে সুন্দর ইনিংস খেলেন। অবশ্য শেষ অবধি অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে ম্যাচ জেতে।

টেস্টে এই ১৬৬ কিন্তু সাঈদের সর্বোচ্চ রান নয়। ১৯৬৫-র এপ্রিলে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে করাচিতে তিনি পাকিস্তানের মোট ৩০৭ রানের (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার) মধ্যে করেন ১৭২—বাকিদের কেউ ৩০ রান পর্যন্ত করতে পারেননি।

অফ-ব্রেক বোলার হিসাবে সাঈদ টেস্টে ৩৬.৪৫ রানের গড়ে মোট ২২টি উইকেট পান। বেস্ট বোলিং করেন অধিনায়ক হিসাবে প্রথম টেস্টে—ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৬৪ রানে চার উইকেট আর ৪৪ রানে দুই উইকেট। তবে তার সুন্দর, স্টাইলিশ ব্যাটিং-এর জন্যই সাঈদ আমেদকে অনেকের মনে থাকবে।



সাঈদ আমেদ

আগা খান গোল্ড কাপ ফুটবল চলছে, কিন্তু মন ভরছে না

ঢাকা থেকে আবদুল তৌহিদ ঃ বহু আকাঙ্খিত আগা খান গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ঢাকায়। ঢাকায় ফুটবল প্রিয় দর্শকদের সুনাম আছে ভালো ফুটবলের সমঝদার হিসেবে। গত বছরের ২০তম এশীয় যুব ফুটবলের পর বড় ফুটবল আর তেমন আয়াম করে দেখতে পাননি ঢাকার দর্শকবৃন্দ। ফেব্রুয়ারির এশীয় কাপ ফুটবলে অনেক প্রত্যাশিত বড় ফুটবলও কোন বড় দলের অংশ না গ্রহণে তেমন জমেনি অতএব সকলের আশা, আগা খান গোল্ড কাপ তাদের সে আশা পূরণ করবে। ব্যবস্থাপক বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও চেষ্টা চালিয়েছে। বড় বড় দলকে এবারের আগা খান গোল্ড কাপে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অনেক বিদেশী দলের আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দশটা বিদেশী দল এবারের আগা খান গোল্ড কাপে অংশ নিতে শেষ পর্যন্ত ঢাকায় এসে পৌছল। ঢাকার দর্শকরা দুঃখ পেয়েছেন যখন তারা শুনছেন প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান থেকে কোন দল আসছে না। আগা খান গোল্ড কাপ আমাদের এ মহাদেশে একটি বহুল পরিচিত দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১৯৫৮ সালে এ প্রতিযোগিতা চালু হওয়ার পর থেকে এযাবত প্রতিটি বছরেই একাধিক বিদেশী ফুটবল দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতার জৌলুস যেমন বাড়িয়েছে তেমনি ঢাকার ফুটবল দর্শককুল ফুটবলের আধুনিকতম কায়দা কৌশলের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে পেরে ফুটবলের রসে নিজেদেরকে আরও বেশী করে আসক্ত করে ফেলেছেন। তাই যখন সম্ভাব্য কোন বড় ফুটবল খেলোয়াড়ী দেশের ফুটবল দল আসছে না শুনতে পান, ফুটবলের স্বার্থে না হলেও নিজেদের অতৃপ্তির স্বার্থে দুঃখ পান তারা। আর এবারও তাই হয়েছে যখন দেখা গেছে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া থেকে কোন দল সত্যি সত্যিই এলো না।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মোট চৌদ্দবার এ প্রতিযোগিতা হয়েছে। পরিত্যক্ত হয়েছে দুবার ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে এবং ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক বিপাকের কারণে। অনুষ্ঠিত হয়নি ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের দরুন আর ১৯৭৮ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে ২০তম এশীয় যুব ফুটবলে ব্যস্ত থাকার দরুন। আর ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যায়নি নানান কারণে—সদ্য স্বাধীন আমাদের দেশে এমন বড় একটা ফুটবলের আসরের ব্যবস্থা করার মত অবস্থা তখন ছিল না।



আগা খান গোল্ড কাপ খেলার আগে ইন্দোনেশিয়ার ও দক্ষিণ কোরিয়া দলের পতাকা বিনিময়

ঘোষণা মত এ প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ের খেলা হয় ১১টা স্থানীয় দলের মধ্যে। এটা হয় নক আউট পদ্ধতিতে। চারটি গ্রুপে এগোরাটা দলকে ভাগ করে নক আউট পদ্ধতিতে খেলে ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স, রহমতগঞ্জ, আরামবাগ ক্রীড়া সংস্থা আর ব্রাদার্স ইউনিয়ন দ্বিতীয় পর্যায়ের লিগ খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। এ পর্যায়ের কোন একটা খেলাও কারুর মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। গড্ডালিকা প্রবাহের মত সাদামাটা ফুটবলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এ দলগুলো প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। এ চারটি স্থানীয় দল ছাড়া সরাসরি দ্বিতীয় পর্যায়ের লিগ খেলায় অংশ নিতে বিদেশী ১০টা দল যেমন এল, তেমনি স্থানীয় মোহামেডান স্পোর্টিং আর আবাহনী ক্রীড়া চক্র আগা খান গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে তাদের এযাবত ভালো পারফরমেন্স-এর জন্য এবং বি জে আই সি লিগ শিরোপা জেতার সুবাদে অংশগ্রহণে সক্ষম হলো।

দেশী-বিদেশী মোট ১৭টা দলের খেলা শুরু হওয়ার মুখে সরকারীভাবে টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করা হলো। উদ্বোধন করলেন মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার ১৫ নভেম্বর।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লিগ খেলা হচ্ছে চারটে গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে ভাগ করে। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন আর রানার্স আপ দল তৃতীয় পর্যায়ে রাউণ্ড রবিন লিগে খেলার যোগ্যতা লাভ করবে।

এ পর্যায়ের খেলাগুলোও যে খুব একটা সুবিধের হয়েছে এমন নয়। শ্রীলঙ্কা ও নেপাল থেকে আগত দলগুলো আমাদের স্থানীয় দলের চেয়ে কোন অংশে ভালো না হওয়ায় তারা এ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। এ পর্যায়ের খেলায় দক্ষিণ কোরিও দলকেও বিদায় নিতে হয়েছে। তারা প্রথম খেলাতে ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হেরে গিয়ে এবং দ্বিতীয় খেলায় সিঙ্গাপুরের দলের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে নাস্তানাবুদ হয়েছে। কিন্তু তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য যে দুর্বল একথা মনে করার মত খেলা তারা খেলেননি কিন্তু গোল না পাওয়ায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন তারা।

এক নম্বর গ্রুপে অন্যতম সদস্য দল পাকিস্তানের ফুটবল দল না আসায় আবাহনী ক্রীড়া আর বার্মার ফুটবল এক রকম কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে না গিয়েই রাউণ্ড রবিন লিগে খেলার সুযোগ পেল।

২ নম্বর গ্রুপে লড়াই চলছে চীন ও থাইল্যাণ্ড, সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছে স্থানীয় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবশ্য থাইল্যাণ্ড

তাদের গ্রুপের সব খেলা (মোট ৪টা) খেলে ২টা খেলায় বিজয়ী ও দুটো খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ করে ৬ পয়েন্ট লাভ করে লিগ টেবলের শীর্ষে নিজেদেরকে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর চীন দল এযাবত খেলেছে তিনটি, দুটোতে বিজয়ী হয়ে এবং একটিতে ড্র করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ৫টি। আর মোহামেডান দল তাদের তিনটে খেলায় দুটোতে জয়ী হয়ে ও একটাতে পরাজিত হয়ে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ৪টি। বাকী আছে এ দু'দলের মধ্যে খেলা। যদি মোহামেডান সরাসরি চীনকে হারাতে পারে তবেই তারা টিকতে পারবে নতুবা তাদের বিদায় নিতে হবে এ পর্যায়েই। এ গ্রুপের আর দুটো দল নেপাল আর আরামবাগ বিদায় নিয়েছে ইতিমধ্যেই।

তিন নম্বর গ্রুপের লিগ খেলায় শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি। আফগানিস্তান ইতিমধ্যে তাদের তিনটে খেলা খেলে দুটোতে বিজয়ী আর একটাতে ড্র করে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রাউণ্ড রবিন লিগে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে। বাকী লড়াই চলছে ইরান আর লিগ বিজয়ী বি জে আই সি-র মধ্যে। ইরানের অবস্থা মোটামুটি ভালো। একটি খেলা বাকী আর তা বি জে আই সি-র সঙ্গে আজ রাতে। যদি তারা জেতে কিংবা ড্র করে রাউণ্ড রবিন লিগে তারা খেলবেই কিন্তু যদি তারা হেরে যায় তবে বি জে আই সি কোয়ালিফাই করবে রাউণ্ড রবিন লিগে। ইরানের সংগৃহীত পয়েন্ট হলো দুটো খেলায় তিন আর বি জে আই সি-র দুটো খেলায় দুই। এ গ্রুপের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাদার্স ইউনিয়ন দল তাদের সবকটা খেলায় অংশ নিয়ে একটাতেও পয়েন্ট না পেয়ে বিদায় নিয়েছে আগা খান গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট থেকে।

এরপর চার নম্বর গ্রুপের কথায় আসা যাক। এ গ্রুপের চার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলাই শেষ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল দল ৩ খেলায় ৫ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সিঙ্গাপুরের দল হয়েছে রানার্স ৩টি খেলায় ৪ পয়েন্ট পেয়ে। দক্ষিণ কোরিয়া ভালো খেললেও গোল না পাওয়ার সুবাদে পয়েন্ট পেয়েছে ৩ আর রহমতগঞ্জ ক্লাব একটাও পয়েন্ট না পেয়ে বিদায় নিয়েছে এ টুর্নামেন্ট থেকে।

২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রাউণ্ড রবীন লিগের খেলা। এ পর্যায়ে খেলবে ৪ গ্রুপের ৮টা সেরা দল।

সত্যি কথা বলতে কি এখনও ঢাকায় জমেনি ফুটবল। আগা খান গোল্ড কাপের খেলাতেও আজ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ফুটবল, কুলীন ফুটবলের মনোহারী রূপ আমরা দেখতে পাইনি। গোল হয়েছে একাধিক, বেশ কিছু খেলোয়াড়ের একক ক্রীড়া নৈপুণ্যে আমাদের চমক লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু আজও ফুটবলের যে আমেজ তা এখনও আমরা পাইনি। অতএব সকলের সঙ্গে আমিও আশা করে আছি পরবর্তী খেলাগুলোর জন্য।



ঢাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা নিয়ে কলকাতার মহঃ স্পোর্টিং-এর অধিনায়ক হাবিব ও ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক সান্টু

প্রদর্শনী ফুটবল :

আগা খান গোল্ড কাপ ফুটবলের মধ্যিখানে প্রদর্শনী ফুটবল খেলতে বাংলাদেশে এসেছিল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দল। অমল দত্তের মহমেডান, হাবিবের মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ঢাকায় নামতে না নামতে তারা খেললেন স্থানীয় মোহামেডানের সঙ্গে। প্রদর্শনী খেলা ১-১ গোলে ড্র। ফুটবলের আঁকি-বুঁকি থাকলো কিন্তু ঝামেলায় জড়াতে চাইলো না মেহমান দল। শক্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানানসই খেলা খেললেন মেহমানরা। হাবিব, লতিফ, সমরেশ, গৌরাঙ্গ, অশোক চক্রবর্তী এমন কি নাসির আমেদের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখতে পেলেন না ঢাকার দর্শকরা। অতৃপ্ত ঢাকাকে অতৃপ্তিতে রেখে ওরা খেলে এলেন রাজশাহীতে এবং চট্টগ্রামে। রাজশাহীতে জিতলেন ৩-১ গোলে আর চট্টগ্রামে ২-০ গোলে। ফিরে এসে আবার খেলতে নামলেন ঢাকা স্টেডিয়ামে। আর এবারের প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী ক্রীড়াচক্র। লিগের খেলায় আবাহনী খুব একটা ভালো করেনি এবারে যার দরুন অনেক ঝামেলা সইতে হয়েছে তাদের। অতএব প্রদর্শনী ম্যাচ হলেও 'ভালো খেলা খেলতে হবে আর ভালো ফল করতে হবে' মনোভাব নিয়ে খেলতে নেমে তারা মেহমান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ২১ নভেম্বর।

প্রথম অবশ্য দর্শনীয় গোল করেছিলেন মহমেডানের পক্ষে লতিফউদ্দিন বেশ দূর থেকে কোণাকুণি তীর মাপা শট মেরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অবশ্য স্বপন আচমকা হামলা চালিয়ে আবাহনীর পক্ষে গোল করে খেলায় সমতা আনেন। আর খেলা শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে সালাহউদ্দিনের নিপুণ গোল আবাহনীকে নাটকীয়ভাবে জিতিয়ে দিয়েছে সেদিন।

১৯৩৭ সালে জগদ্বিখ্যাত ইসলিংটন কোরিনথিয়ান ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ঢাকা দল বিজয়ী হয়েছিল ১৯ নভেম্বর। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিজয়ের মুখ দেখেছিল ১৯৭২-এ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে, আবার সেদিন ২১ নভেম্বর ঢাকা আর একবার জয়ের মুখ দেখলো মহমেডানের বিরুদ্ধে।

এ প্রদর্শনী খেলার দরুন আগা খান গোল্ড কাপের খেলায় বাধা পড়েছে কিনা বলতে পারবো না তবে জোলো খেলার মধ্যে সেদিনের প্রদর্শনী খেলা বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় যখন গোলগুলো হয়েছে আর এই গোল হওয়ার দরুন খেলার যে গতি শৈলী তৈরি হয়েছিল, খেলার কারুকার্য যা আমরা দেখতে পেয়েছি, তাতে ক্ষণিক তৃপ্তি ঘটেছে অনেকের।

যাই হোক এ প্রদর্শনী খেলাগুলোর ব্যবস্থা করেছিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের অর্থ সংগ্রহের জন্য। বিপুল দর্শক তাদের নিশ্চয়ই সে সাফল্য এনে দিয়েছে।

২৫.১১.৭৯

ছবি : খন্দকার তারেখ

সংবাদ চিত্র



প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন—ক্রিকেটের জুনিয়র বাংলা দল / শংকর





নবম আন্তঃরেল জিমন্যাসিয়ামে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ পূর্ব রেল দল/শংকর নাগ দ.স.

এশিল্ড শিল্ড বিজয়ী (১৯৭৯) আশুতোষ কলেজ ফুটবল দল / শংকর



দাস, সুখরঞ্জন ঘোষ, প্রণব ঘোষ ও কমল মুখার্জি / শংকর নাগ দাস ,



হকির দলবদলে লাভবান হল কি ইস্টবেঙ্গল ?

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এক সময় ভারতীয় হকির ঝলমলে দিনগুলিতে বাংলার খেলোয়াড়দের বিরাট ভূমিকা ছিল। হকিতে বাংলার কৌলীন্য হাতছাড়া হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। বর্তমানে হকি লিগ ও ঐতিহ্যশালী বেটন কাপের যে চেহারা, তাতে একসময়ের বাংলার এই জনপ্রিয় খেলাটির অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখাই মুসকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

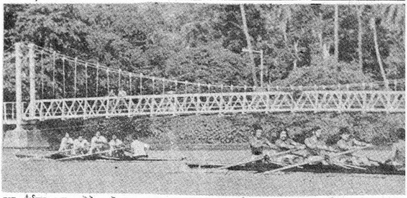
প্রতি বছরের মত এবারেও হকিতে দল-বদল শেষ হল। ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ এক মাসে মোট ২৪৯ জন ছাড়পত্রে সই করেছিলেন দলত্যাগের বাসনায়। অবশ্য এদের মধ্যে ৫৩ জন পরে পুরনো দলের পক্ষে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

১৯৭৬-৭৭ ও '৭৮ টানা তিন বছর বেটন কাপ জয়ের রেকর্ডধারী মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের মধ্যে ৪ জন ছাড়া আর সকলেই রয়েছেন। রেকর্ড গড়ার পথে দল ছুট হয়ে যাওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের দুই বিশ্বস্ত গোলন্দাজ উমেশ কুমার ও বর্ষীয়ান কুলতার সিংয়ের বিরাট অবদান ছিল। কুলতার ও উমেশ আগামীতে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন। দুজনকে হারিয়ে মোহনবাগান যত না ক্ষতিগ্রস্ত তারচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে বিপক্ষ শিবির ইস্টবেঙ্গল থেকে দ্রুত গতিসম্পন্ন দুই ফরোয়ার্ড যশমিন্দার সিং ও রাসেল প্যারিসকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে। এছাড়াও রাজস্থানের চৌকশ ফরোয়ার্ড ওয়ারেন ওয়ার্ড ও মোহনবাগানের নতুন সংযোজন। ডিফেন্সে বীরেন্দ্র বাহাদুর ও বিনোদ খাণ্ডেলকরকে ধরে রাখলেও গতবারের নির্ভরযোগ্য লড়াকু ডিফেণ্ডার সুরিন্দার সিং সাকসেনার ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক ক্লাবে যোগদানে ক্লাবের রক্ষণভাগের ওজন কিছুটা কমে গেল। গতবারে দলে আসা অপর ডিফেণ্ডার দীর্ঘকায় চেহারার শিখ যুবক গুলজার সিং ফিরে গেছেন পুরনো দল সি ই এস সি-তে। রাজস্থান থেকে কার্তিক বৈরাগীও মোহনবাগানের পক্ষে নাম সই করেছেন। মোহনবাগানের অভিজ্ঞ লেফট উইং হাফ ইউজিন জোনিংস প্রথমে এম এম সি-র পক্ষে নাম সই করে, পরে ইজাজ হোসেন, দর্শন সিং, হরকিরাত সিং গোষ্ঠীর মত পুরনো দলে থেকে গেছেন নাম প্রত্যাহার করে।

তিন প্রধানের অন্যতম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লাভের তুলনায় ক্ষতির অংকটা বেশ বড় সড়। মোহনবাগান থেকে আসা উমেশ কুমার ও কুলতার সিংকে আক্রমণভাগে জুড়ে দিলেও রাসেল প্যারিস ও গতবারের অন্যতম স্কোরার যশমিন্দার সিংকে হারিয়ে ফরোয়ার্ড লাইন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতবারের অধিনায়ক জাফর খানের সঙ্গে আরসাদ খান ও মোতিউর রহমানকে পেয়েছেন অন্যতম শরিক মহমেডান স্পোর্টিং। অবশ্য মহমেডান থেকে বর্ষীয়ান ব্যাক জার্নেল সিং আবার দলে ফিরেছেন। এছাড়া পোর্ট ট্রাস্টের তরুণ গোলকীপার দীপক সাহা, খালসা ব্লুজের ডিপ ডিফেণ্ডার মালকেইত সিংকে দলে টেনে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

এবারের দলবদলে মহমেডানের সবচেয়ে কম শক্তিক্ষয় হয়েছে। একমাত্র জার্নেল সিং ছাড়া গতবারের সকলেই দলে রয়েছেন। আরসাদ খান, জাফর খান, মোতিউর রহমান খানকে পেয়ে মহমেডানের লাভের পাল্লা ভারী হয়েছে।

এছাড়া মাঝারি শক্তির দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে রাজস্থান। চৌকশ ফরোয়ার্ড ওয়ারেন ওয়ার্ড (মোহনবাগান) হাতছাড়া হয়ে গেলেও এন্টালির প্রতীক ব্যানার্জি ও শ্যামল বসুর মত বেশ কিছু ভাল খেলোয়াড়কে এবার রাজস্থান সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি ফাইটিং সাইড হিসেবে পরিচিত সি ই এস সি, ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন ও এফ সি আই থেকে দু' একজন খেলোয়াড় বেরিয়ে গেলেও দলগত শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি।



চার দাঁড়ির নক আউট ফাইনালে আশুতোষ কলেজ আগে। পিছনে যোগেশচন্দ্র। ছবি ঃ গৌতম বকসি

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন আন্তঃকলেজ রোয়িং

স্কালার ঃ রবীন্দ্র সরোবরের এক হাজার গজ দীর্ঘ লেক ক্লাব কোর্সে ১ থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ রোয়িং প্রতিযোগিতায় এবারকার প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ছিল ছয়। ১) নক আউট বিজয়ী ও লিগ রানার্স আশুতোষ কলেজ, ২) লিগ বিজয়ী ও নক আউটে রানার্স যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ ছাড়াও এবারকার প্রতিযোগিতায় আরও যোগ দেয় প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি ও চারুচন্দ্র কলেজ। বহুবারের পদকের অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি যেমন, তেমনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজও গোড়ায় কিছুটা উৎসাহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত কোন 'ক্রু'ই পাঠায়নি। দুই বিশেষ দলই যোগদান না করার ফলে এবারকার প্রতিযোগিতা ছিল বিশেষ ম্রিয়মাণ।

৪ তারিখের সকালের নক আউট পর্যায়ের ফাইনালে বিজয়ী আশুতোষ কলেজের বিরুদ্ধে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি। লিগ ফাইনালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ আশুতোষ কলেজকে আধ ক্যানভাস ব্যবধানে পরাজিত করলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না লেশমাত্র—যেন ফলটা পরিকল্পিত।

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নিযুক্ত রেজিস্ট্রার প্রতীপ মুখোপাধ্যায় নতুন করে আশ্বাস দেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাব সংলগ্ন রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলার পরিকল্পনার কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই শুরু করার চেষ্টা হবে।



ভক্ত আমি

মোহনবাগান মোহনবাগান
আমি দিনরাত গাই তোমা গান
আমি তোমার ভক্ত
তোমার নামেতে মত্ত,
দেখি কেমন খেলে বিদেশ
দেখে বলি বেশ বেশ বেশ।
শ্যাম থাপা আর এক রত্ন,
কোরো তাকে একটু যত্ন।
গৌতম আর এক খেলোয়াড়
চেষ্টা খালি গোল দেবার।
এদের নিয়েই তোমার দল,
হচ্ছে তাহার ভালোই ফল।

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়
৩৯ ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন
শিবপুর হাওড়া-২
বয়স—১১ বৎসর



উঠছে যারা

সুখ ও দুঃখ

আমি হলাম ইস্টবেঙ্গল,
বোনটি মোহনবাগান।
আনন্দেতে নাচ্ছে যে তাই,
ছোট্ট বোনের প্রাণ
আমার যে খুব মনটি খারাপ
হারল আমার দল,
তাইতো এখন ভাবছি বসে
ঝরছে চোখের জল ॥

স্বস্মিতা ভৌমিক (বয়স ৮ বৎসর)

নজীরবিহীন গাভাসকার

সুনীল মনোহর গাভাসকার
জন্মক্ষণে পাল্টে গিয়ে
ধোপার ঘরের ছেলে হয়ে
হয়তো এতদিন হয়ে যেত
কাপড় কাচায় সমঝদার ॥

বিধির লিখনে তা হল না
মামার দেখায় ভুল হল না
ছোটবেলার থেকেই সে যে
ব্যাটকে করল হাতিয়ার ॥

বয়স বাড়ার সাথে সাথে
ক্রিকেট খেলায় উঠল মেতে
নাওয়া খাওয়া ভুলে গেল
ব্যাটই হলো সঙ্গী তার ॥

একুশ বছর পূর্ণ হলো
ভারত টিমে স্থান যে পেলো
টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম খেলা
ক্যারিবিয়ানদের করলো হেলা
তাজ্জব বনে গেল যত
বিখ্যাত সব বোলার ॥

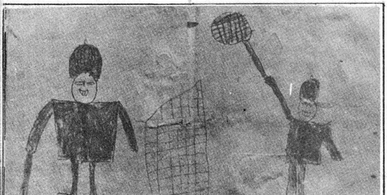
স্বকল্পিতা ভৌমিক (১৩)



সিধু দাদুর খেল

সিধু দাদুর বড়ই যে সখ
ফুটবল তিনি খেলবেন
গোলের দিকে বল মারলেই
গোলটি তিনি করবেন
বলটা রেখে কিক করতেই
যেই না উলটে পড়বেন
হেঁইয়ো বলে উঠে পড়ে
বাড়ির দিকে ছুটবেন।

মৌসুমী চৌধুরী (১৪)
বালীগঞ্জ, কলকাতা-২৯



ছবি এঁকেছে রাজর্ষি রায় (৬ বছর) সাতগ্রাম, কলকাতা-৬১

ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি, কুড়ি বছরের স্মার্ট, একহারা চেহারার যুবক। বাস বালিগঞ্জে। ওকে দেখলাম সেদিন বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে, বাস স্ট্যাণ্ডের বিপরীত দিকে ভারত—পাকিস্তান প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের স্কোর লিখছেন একটি বোর্ডে।

পরিচয় হল। মাস ছয়েক আগে চাকরি পেয়েছেন এক সিগারেট প্রস্তুতকারক সংস্থায়। কাজ মার্কেট রিসার্চ করা। তারই ফাঁকে কোম্পানির নির্দেশে এই কাজ। কানে রেডিও, যা শুনছেন বোর্ডে সেইমত নিখুঁত স্কোর লিখছেন। মাঝে মাঝে ভিড় জমে যাচ্ছে। দু/একজন বেশী কিছু জানতে চাইছেন, ইন্দ্রজিৎ তাও জানাচ্ছেন হাসিমুখে। কারণ 'এই মুহূর্তে এই আমার ডিউটি'।

'কেমন লাগছে ?'

'বেশ ভাল, অস্ট্রেলিয়া-ভারত সব কটি টেস্টেও করেছি, হয়ত বাকি টেস্টগুলোও করতে হবে।'

সিগারেট কোম্পানি করছে তার বিক্রির স্বার্থে. বোর্ডের প্রথমেই জল জল করছে 'তাবাক' ব্রাণ্ডের নাম। ওরা এমন স্কোর বোর্ডের ব্যবস্থা করেছেন বালিগঞ্জ ছাড়াও হাজরা রোডের মোড়ে, ফেয়ারলিতে, পূরবী সিনেমার কাছে, ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ-এ এবং নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে। প্রতিটি কেন্দ্র এমন একজন করে যুবকের দায়িত্বে। বালিগঞ্জে ওর সঙ্গে আরও একটি যুবককে দেখলাম।

'ও আমাদের পাড়ার, বন্ধু। তাই—আছে আর কি।'

মেয়ে ফুটবল—এশীয় টুর্নামেণ্ট

আগামী বছর ১১ জানুয়ারি কেরালার কালিকটে বসছে মেয়েদের ফুটবলের এক বড় আসর। তৃতীয় এশিয়ান মহিলা ফুটবল টুর্নামেণ্ট। প্রথম টুর্নামেণ্ট হয়েছিল হংকং-এ, দ্বিতীয়বারের আসর বসেছিল ফরমোজার তাইপেতে। '৭৭ সালের এই আসরে ১০টি দেশ যোগ দেয়। ভারত যোগ দেয়নি। বলা-বাহুল্য তার আগের আসরেও ভারত ছিল অনুপস্থিত। এবারেই ভারত যোগ দেবে শুধু তাই নয়; দু'টি দল 'ইণ্ডিয়া এস' ও 'ইণ্ডিয়া এন' খেলবে এই টুর্নামেণ্টে। এছাড়া এ পর্যন্ত অন্য যেসব দেশ এই টুর্নামেণ্টে খেলতে আসবে বলে ইতিমধ্যে কথা দিয়েছে তারা হল—মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং ও ফরমোজার একটি দল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী কে পি সারদা কয়েকটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলছেন যাতে তারা দল পাঠায়। আপাতত উনি দেশের বাইরে। ফিরে এলে শ্রীমতী আরতি ব্যানার্জি যাবেন বাংলাদেশে, উদ্দেশ্য একই।

কড়চা—ময়দানের নয়

ভারতীয় ফুটবলে বাংলার নামডাক প্রচুর। ভারতের দুটি দলে বেশ কিছু বাংলার মেয়েকে দেখা যাবে স্বাভাবিকভাবেই। ওদের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। অনুশীলন শিবির বসছে সম্ভবত বাঙ্গালোর অথবা মাদ্রাজে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই। ৫০টি মেয়ে এই ক্যাম্পে একমাস ট্রেনিং নেওয়ার পর দুটি দলের জন্য ১৫ জন করে ৩০ জনকে বেছে নেওয়া হবে চূড়ান্ত দলের জন্য। একমাস ট্রেনিং নেবার পর ওরা ক্যাম্প থেকে সরাসরি প্রতিযোগিতার আসরে নামবেন। মেয়েদের আশা ওরা প্রথমবার খেলার সুযোগে এশিয়া-শ্রেষ্ঠ আখ্যা পাবেনই।

সবচেয়ে ভাল—ইলিশ

১৪ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দল (ফুটবল) বাংলাদেশ সফর করল। ১৪ তারিখে ঢাকায় পৌঁছেই কোনক্রমে জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নেমেছিল ওরা। প্রতিপক্ষ ঢাকার মহমেডান স্পোর্টিং। খেলা অমীমাংসিত রইল (১-১)। কিন্তু কলকাতার ছেলেরা তাজ্জব ৫, ১০, ২০, ৩০ ও ১০০ টাকা মূল্যের কোন আসন খালি নেই। পরন্তু লাখখানেক দর্শক ধরে এমন স্টেডিয়াম উপচে দর্শকরা চলে এসেছে মাঠের মাঝে। খেলা শুরু সাড়ে সাতটায়। দর্শকরা নাকি দুপুর থেকে হাজির। ভাগ্যিস কর্মকর্তারা ইণ্ডিয়া এয়ারলাইন্সের নির্দিষ্ট বিমানের দেরী দেখে বাংলাদেশ বিমানে তড়িঘড়ি তুলে দিয়ে-ছিলেন। না হলে—

মহমেডান ওখানে খেলেছে মোট ৪টি। প্রথম খেলা অমীমাংসিত. দ্বিতীয় খেলা যশোহরে—যশোহর একাদশের বিরুদ্ধে মহমেডান জিতল (৩-১) গোলে। যশোহরের পরের খেলা চাটগাঁয় (চট্টগ্রাম) এখানেও জয় (২-০)। কিন্তু শেষ খেলায় মহমেডান ঢাকা লিগের রানার্স দল আবাহনীর চক্রের কাছে হেরে গেল (১-২)।

কলকাতায় বসে কথা হচ্ছিল দলের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় সুভাষ রায়ের সঙ্গে ও স্বভাবতই জীবনে এই প্রথম বাংলাদেশ গেল এবং খেলল। ওখানে সবচেয়ে কি ভাল লাগল ? এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষ বললেন-'ওখানে মাঠগুলো সত্যিই সুন্দর, প্রতিটি খেলায় খেলেছি আডিডাসের বলে। ওরাও ওই বলে খেলে, স্বভাবতই বলগুলোও ভাল। দর্শকরা আমাদের এখানের মতই—ফুটবল পাগল। হাবিবদা, আকবরের নাম সবার মুখে মুখে। ভাল লেগেছে নদী, গাছপালা ও লঞ্চে ভ্রমণ। কিন্তু সবচেয়ে যা ভাল লেগেছে তা হল ইলিশ মাছ। তুলনা হয় না। এমন মাছ। আমি জীবনে খাইনি। ওই স্বাদ। মনে হয় এখানের ইলিশ ইলিশই নয়। আমরা সকলে যত পেরেছি খেয়েছি। বিশেষ করে পিণ্টুদা, (সমরেশ চৌধুরী)। পিণ্টুদার আদি বাড়ি চাটগাঁ। খেলতে গিয়ে দু/চারজন আত্মীয়ের খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানেও ইলিশ। একদিন লঞ্চ থেকে নেমে পিণ্টুদা হোটেলে গিয়ে বললেন কি মাছ আছে দাও। এল ইলিশ। পিণ্টুদা খেলেন প্রাণভরে। সত্যিই প্রাণভরে খাবার মত জিনিস।'

'চাটগাঁর শুঁটকি মাছ খেয়েছো ?'

'না—তা আর হয়ে ওঠেনি তাড়াতাড়ির জন্য। পিণ্টুদা অবশ্য বলেছিলেন—রান্না ঠিক মত হলে সে বস্তুও ভোলার নয়। চাটগাঁয়ের বন্দরের মত শুঁটকিও নাকি বিখ্যাত।'



অবিক্রিত টিকিট কি জেলার উঠতি খেলোয়াড়দের জন্য ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেস্ট টিকিট বণ্টনের নতুন নীতির ফলে মেদিনীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা অদ্ভুত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সদ্য সমাপ্ত ভারত অস্ট্রেলিয়ার কলকাতা টেস্ট উপলক্ষে সরকার প্রতি জেলার জেলা শাসককে এই প্রথমবার ২৫টি করে টেস্ট টিকিট পাঠান একেবারে শেষ মুহূর্তে বিক্রির জন্য। সেই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রকের একটা সার্কুলার ছিল— এই টিকিট জেলার তরুণ উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে বিক্রি করা হোক, তবে স্থানীয় বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে এই টিকিট বিক্রি করতে হবে। টিকিটগুলি ছিল ১৫টি ১৮০ টাকার, ২টি ১২৫ টাকার ও ৮টি ৭০ টাকা দামের।

এখন প্রশ্নঃ জেলার খেলোয়াড়রা কি এতো দামের টিকিট কিনে খেলা দেখতে



সক্ষম ? আর অবিক্রিত টিকিটগুলি কি জেলার উঠতি খেলোয়াড়দের জন্য ? পূর্ব-প্রেরিত ৩৫টি টিকিট লটারির মাধ্যমে বিক্রির পরে টেস্ট শুরু হওয়ার মাত্র দুদিন আগে ২৫ খানি টিকিট পাঠিয়ে জেলা শাসককে বিপদে ফেলেননি সরকার, বিপদে ফেলেছেন জেলা ক্রীড়া-সংস্থাকে। কারণ টিকিট পাওয়া মাত্রই ২৪ অক্টোবর জেলা শাসক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ডেকে এই টিকিট বণ্টনের সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ করতে বলেন। সবাই জানেন এবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া কলকাতা টেস্ট-টিকিটের খুব একটা চাহিদা ছিল না। তাই এই টিকিট শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের ডেকে এনে 'পুশ সেল' করা হয়। এ ব্যাপারে সাহায্য করেন জেলার উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারেরা। এখন আমার প্রশ্ন, সরকারের এই অদ্ভুত নীতির ফলে সবাই বিপদে পড়লেন না কি ?

এক্ষেত্রে সরকারের উচিত উঠতি খেলোয়াড়দের জন্য কম দামী টিকিট দেওয়া যাতে তারা সহজে খেলা দেখতে পারে। এম এল এ-দের সঙ্গে পরামর্শ করে টিকিট বিলি করা অনেকের পছন্দ নয়। কারণ এম এল এ ক্রিকেটের কিছুই বোঝেন না, খোঁজ-খবরও রাখেন না। কে জেলার উঠতি খেলোয়াড়, কে নয় তা তারা জানবেন কি করে ? বরং জেলার স্থানীয় ক্রীড়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে টিকিট বিলি করা যেতে পারে। তবে টিকিট শেষ মুহূর্তে না পাঠিয়ে অন্তত দশ দিন আগে পাঠানো উচিত। সামনের জানুয়ারিতে ভারত-পাকিস্তান টেস্টের আবার আসর বসছে ইডেনে। সরকার তখন আমার বক্তব্যগুলো একটু ভেবে দেখতে পারেন।

সমীরণ মজুমদার, সম্পাদক : অমৃতলোক,
স্টেশন রোড, মেদিনীপুর।

শততম টেস্ট

ভারত বনাম পাকিস্তানের চলতি টেস্ট সিরিজে প্রথম টেস্ট ম্যাচটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। ভারতের কাছে এই টেস্টটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে নানা কারণে। সেই কারণগুলির উল্লেখ করছি।

১। ভারত তার শততম টেস্টটি তার নিজের দেশের মাটিতে খেলল।

২। ভারত এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে খেলল যেটি একসময় ভারতেরই অংশ ছিল।

৩। বিদেশের মাটিতে প্রথম পাকিস্তানের বিখ্যাত মহম্মদ ভাইদের কেউ খেললেন না।

৪। এই টেস্টে পাকিস্তানের এহতেসামউদ্দিন এবং ভারতের রজার বিন্নি জীবনের প্রথম টেস্ট খেললেন।

৫। এই টেস্টে যতটুকু উত্তেজনা ছিল তা হল, কোন দল প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যেতে পারে ? ভারত অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়।

৬। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের মতন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাও প্রত্যেকে কিছু না কিছু রান করেছেন।

৭। ভারতের উইকেটরক্ষক কিরমানি এঞ্জিনিয়ারের রেকর্ড স্পর্শ করলেন।

৮। বৃষ্টির জন্য প্রায় একদিন খেলা বন্ধ থাকে।

সনৎ কুমার চক্রবর্তী ও মনোজ কুমার চক্রবর্তী
ডানলপ, কলকাতা-৩৫।

স্বদেশে 'রাবার' জয়ী অধিনায়ক গাভাসকর

আমরা, আমাদের দেবতাতুল্য প্রিয় ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তার অসাধারণ অধিনায়কত্বের জন্য। তিনি স্বদেশের মাটিতে অধিনায়ক হয়ে কালীচরণের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে এবং কিম হিউসের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে 'রাবার' লাভ করেছেন। আমরা এখন ভাবি যদি ইংল্যাণ্ডে ভেঙ্কট-রাঘবনের জায়গায় গাভাসকর অধিনায়ক হতেন, তাহলে বোধহয় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও আমরা 'রাবার' লাভ করতে পারতাম। যেহেতু স্বদেশের মাটি উল্লেখ করেছি, সেই হেতু দেখা যাক অধিনায়ক গাভাসকর আবার স্বদেশের মাটিতেই দুর্ধর্ষ অসাধারণ শক্তিশালী আসিফ ইকবালের নেতৃত্বে পাকিস্তানকে হারিয়ে 'রাবার' লাভ করতে পারেন কিনা ?

তাপস, স্বরাজ, বিল্টু চম্পু, সতু,
সীতারাম রোড, ডিব্রুগড়, আসাম।

ধন্যবাদ

আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের 'বিশেষ ক্রিকেট সংখ্যা' এক কথায় অপূর্ব, ওয়াণ্ডারফুল !

সেই জন্যে আমাদের মন এখন অনেক শান্ত। যেমন ফটো সুন্দর, তেমনি সুন্দর রিপোর্টারদের লেখনী।

এছাড়া 'টেস্ট ক্রিকেটে···অলরাউণ্ডার সেরা কে' এই রচনাটি খেলার আসরকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। এই জন্যেই

নায়ারের কন্যার বিবাহে আমাদের সকলের অনেক শুভেচ্ছা রইল। এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চিঠি শেষ করছি।

অশোক, বাচ্চু, টিকলু বসু,
পারবীরহাটা, বর্ধমান।

ভুল প্রতিবাদ

২ নভেম্বরের অনিরুদ্ধ চন্দের প্রতিবাদটি পড়লাম। উনি লিখেছেন আমরা নাকি ক্রিকেটের আইন কানুন না জেনেই চিঠি লিখেছি। কিন্তু ওর জানা উচিতকোন বিষয়ে প্রতিবাদ করতে হলে আগে আলোচ্য বিষয়ে বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উনি আমাদের চিঠির প্রতিবাদ করে কতোটা যে অজ্ঞতার কাজ করেছেন, সেটা নরোত্তম পুরীর লেখা 'ক্রিকেট কুইজ' নামক বইটির ১১৫ পৃষ্ঠার ৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি ভালোভাবে পড়লেই বুঝতে পারবেন। ওটা ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিয়ে নিজের ভুল শুধরে নেবেন। এবং আশা করব ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে নিজে পুরোপুরি না জেনে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাবেন না।

সুবীর সেনগুপ্ত ও মাঠু গাঙ্গুলি,
জামালপুর, মুঙ্গের, বিহার।

ছোট দলের খেলোয়াড় কেন বঞ্চিত !

কলকাতা মাঠে ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে উন্মাদনা ও উদ্দীপনা দেখা যায়- ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে এরকম ভাবাই যায় না। ভারতীয় ফুটবল দু'বার মাত্র এশিয়ান গেমস থেকে সোনা পেয়েছে, তাতে অধিকাংশই ছিল বাংলার তদানীন্তন বিখ্যাত ফুটবলাররা।

পাঠকের কলমে

ভারতের অন্যরাজ্যের অধিবাসীরা আজ এক বাক্যে স্বীকার করে যে, তাদের পশ্চিমবাংলাকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। ট্রেনে আসতে আসতে যখনই মাঠের দু'ধারে গোলপোস্ট দেখা যায়, তখনই বোঝা যায় আমরা বাংলায় প্রবেশ করেছি। কিন্তু যে রাজ্যে ফুটবলকে কেন্দ্র করে এতো উন্মাদনা সেখানেই আজ ফুটবলকে নিয়ে রাজনীতি চলেছে। যার শিকার হচ্ছে কলকাতা ফুটবল লিগের ছোট ছোট ক্লাবের খেলোয়াড়রা। আজ ছোট দলের ভালো খেলোয়াড়দের প্রতি বড় দলের কোন কর্মকর্তার কোন উৎসাহই দেখা যায় না। তাদের দৃষ্টি ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়দের প্রতি। তার প্রমাণ তো এই বছরই পেলাম। কিন্তু আগে খিদিরপুর, এরিয়ান, টালিগঞ্জ প্রভৃতি দল থেকে খেলোয়াড়দের বড় দলে নেওয়া হতো, কিন্তু এখন তারা বঞ্চিত। অথচ আজকের যারা স্টার একদিন তারাও ওই ছোট দলে খেলতেন। তাছাড়া অনেক ভালো ফুটবলার আছে যাদের বাধ্য হয়েই ছোট দলে খেলতে হয়। তার একমাত্র কারণ অর্থনৈতিক। এমন দুজন ফুটবলারের নাম উল্লেখ করছি। যেমন প্রথমজন মিলন বড়ুয়া ১৯৭৯-তে পুলিশ দলের অধিনায়কত্ব করেছে। সত্যি যারা পুলিশ দলের খেলা দেখেছে তাদের প্রথমেই তার প্রতি দৃষ্টি গেছে। আজ হয়তো খিদিরপুর বা এরিয়ানে খেলার মত যোগ্যতা মিলনের আছে, কিন্তু খিদিরপুর বা এরিয়ান তো প্রথমেই তাকে চাকরি দেবে না ? তাছাড়া অন্য দলে সই করলে তাকে তো পুলিশের চাকরি ছাড়তেই হবে। সুতরাং ওই রিস্ক কিভাবে নেবে ? একই রকম অবস্থা সাবারবানের স্বপন চৌধুরীর। যত সুন্দরই খেলুক না কেন, তাদের সামনে আজ একটি মাত্র সমস্যা অর্থনৈতিক ! তিন প্রধানের পরবর্তী পর্যায়ের দলগুলির কর্মকর্তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা দয়া করে এই সমস্ত খেলোয়াড়দের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন। না হলে এরা অচিরেই ঝরে যাবে।

সঞ্জয় দে, প্রভুরাম সরকার লেন,
কলকাতা-১৫।

সাবাস হাবিবদা

৫-১২ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত 'হাবিবের অভিনব প্রয়াস' রচনাটির জন্য লেখককে প্রথমেই আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি এই রচনা লেখার জন্য নিশ্চয় পাঠক সমাজে যশস্বী হয়েছেন। হাবিবকে আমি একজন কৃতী ফুটবলার হিসাবেই জানতাম। ফুটবলের মাধ্যমে তিনি আমাদের অনেক কিছুই উপহার দিয়ে গেছেন। ফুটবলার ছাড়া তার যে আর একটা দিক আছে, এটা আমরা ক'জনে জানতাম ? সামান্য এক মালীর জন্য প্রদর্শনী ম্যাচ ক'জন খেলোয়াড় করেন ? এটা ফুটবল জগতে এক নতুন রেকর্ড নয় কি ? তার এই মহৎ কাজের জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। হাবিবদার এই নিদর্শন অনুসরণ করে অন্যান্য খেলোয়াড়দের উচিত নয় কি দুঃস্থ খেলোয়াড় বা দুঃস্থ মালীদের সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করা ?

বিশ্বনাথ পুরকাইত, হেরম্বচন্দ্র কলেজ,
প্রথম বর্ষ ; বাণিজ্য বিভাগ।

বাঙালীর গর্ব করার শুধু ফুটবল

ডি সি এম ট্রফি খেলায় হাবিব আকবরের অসভ্যতার উপযুক্ত জবাব দেওয়ায় কোচ অমল দত্তকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আজ আমাদের গর্ব করার মতো একটা জিনিসই টিকে আছে, আর তা হল ফুটবল। কিন্তু মাঝে মাঝে এই বড় বড় ফুটবলারদের নোংরা আচরণ দেখে লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে মন বিষিয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে অমল দত্ত প্রদীপ ব্যানার্জির মতো দৃঢ়চেতা কর্ণধাররাই আমাদের ভরসা। অমলদা জিন্দাবাদ !

আর একটা কথা। 'খেলার আসর'এর কর্তৃপক্ষকে আমার একটা প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি, আপনারা একটা রিলিফ ফাণ্ড খুলুন—যেমন 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া' রিলিফ ফাণ্ড খুলেছে। দুঃস্থ খেলোয়াড়দের জীবন কাহিনী পড়তে পড়তে চোখে জল এসে যায়। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। কিছু করতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। কারণ ৫০০/১০০০ টাকা সাহায্য করার ক্ষমতা আমার মতো গরীবের নেই। কিন্তু ৫/১০ টাকা তো দিতে পারি। আর তা সম্ভব হয় যদি আপনারা একটা রিলিফ ফাণ্ডের ব্যবস্থা করেন। আমার মনে হয় আমার মতো গরীব ক্রীড়ামোদীরা তাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সত্যরঞ্জন পাত্র, মুলুণ্ড বোম্বে।

বাংলা কি সত্যিই দুয়োরানী দিল্লি রাজের

কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবাংলা কি সত্যিই দিল্লি রাজের দুয়োরানী ? তা না হলে কেন এ অবিচার, কেন এ অবহেলা ? গত

কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ক্রীড়া জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। তার কতগুলি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করছি :

১। বিক্রিত টিকিটের থেকে আয় সব চেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও তিনটি ক্রিকেট টেস্ট সিরিজের ক্ষেত্রে কলকাতার জন্য একটিও টেস্ট রাখা হয় না, (১৯৭৬-৭৭ সালে নিউজিল্যাণ্ডের ভারত সফর)।

২। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গ-সন্তান হয়েও দিল্লিতে এশিয়ান গেমস করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কলকাতার নাকি এশিয়ান গেমস চালানোর ক্ষমতা বা সঙ্গতি নেই। দিল্লির গেমস কি দিল্লিওয়ালাদের অর্থে চলবে?

৩। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ দূরদর্শনে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত এবং দিল্লি ও লক্ষ্মৌয় দূরদর্শনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-পাক টেস্টগুলি দেখানো হওয়ার কথা সত্ত্বেও কলকাতাবাসী দিল্লি ও কানপুর টেস্ট দেখা থেকে বঞ্চিত হবে ডাক ও তার বিভাগের খামখেয়ালীপনার জন্য।

৪। বাংলা ক্রিকেট দলের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় রাজু মুখার্জি, উদয়ভানু ব্যানার্জি পূর্বাঞ্চলে সুযোগ পায় না—তার বদলে যারা দলে আসে তারা হল অখ্যাত রবি পাণ্ডা, প্রায় অবসরপ্রাপ্ত রমেশ সাকসেনা প্রমুখ।

এতো শুধু মাত্র চারটি। এছাড়া এরকম বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে বহু কুচক্রী ব্যক্তি যারা কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলাকে পদদলিত করে রাখতে চায়। এ আর কতদিন চলবে? জানি, আমার এ আবেদন দিল্লি-রাজের সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাবে না, তবু এটুকু ভেবে আশান্বিত হব, এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে পাঠকের কলমে উঠবে প্রতিবাদের ঝড়।

দেবাশীষ গাঙ্গুলি, কলকাতা-১৪

তারাশঙ্কর নয়, সুশান্ত

গত ২১ সেপ্টেম্বর '৭৯ প্রকাশিত খেলার আসরের অমল ত্রিবেদী লিখিত 'আন্তঃজেলা জুনিয়র ফুটবলে অঘটন ঘটাল নদীয়া' শিরোনামে গত ১৫ আগস্ট বাঁকুড়া-মানভূম (পুরুলিয়া) খেলার দ্বিতীয় গোলের বিবরণ সম্পর্কে তথ্যগত কিছু ভুল আছে। বিরতির তিন মিনিট আগে মিলন ঘোষের ফরোয়ার্ড থ্রু পাশ থেকে দু'জন ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে গোলটি করেছিলাম আমি, সুশান্ত ঘোষ, (জার্সি নম্বর ১১) তারাশঙ্কর ব্যানার্জি নয়।

সুশান্ত ঘোষ, ডি এস এ, বাঁকুড়া।

জামসেদপুরে খেলাধূলায় বাঙালী

অমল ত্রিবেদী শারদীয়া খেলার আসরে জামসেদপুরের খেলাধূলার ইতিহাসে বাঙালীরা রচনায় যে তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে একটি বড় খবর বাদ গেছে।

জামসেদপুরে বাঙালীদের মধ্যে কেবল নয়, জামসেদপুরের মধ্যে একমাত্র একজন ছেলেই ১৯৭১ সাল নাগাদ বর্তমানে মোহনবাগানের অধিনায়ক দিলীপ পালিতের নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিল। এবং সে বছর দল যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। তার নাম তপন কুমার ভদ্র। সে তখন সাকচী এ সি-তে খেলত। দয়া করে এ সম্বন্ধে খেলার আসরে আলোকপাত করবেন। নইলে এখানকার বাঙালীদের সম্বন্ধে একটি বড় খবর চাপা থাকবে।

সঞ্জয় কুণ্ডিয়া, জামসেদপুর।

মনে রাখবেন 'পাঠকের কলম' গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

পাঠকের কলমে বিভিন্ন মন্তব্য ও বিভিন্ন প্রকার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তার মাধ্যমে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারি। এইজন্য 'খেলার আসরে' এই (পাঠকের কলমে) বিভাগটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কয়েকটা চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন মতবাদ যা খেলাধূলার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ রাখে না। এমন কয়েকজন আছেন যারা কেবল একটি বিশেষ মন্তব্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাদ-বিবাদ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। একটি মন্তব্যকে উল্লেখ করে বিশেষ দু'পক্ষে চলে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ঘটা। তাছাড়া দেখা যায় কয়েকটা চিঠি পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক মনোভাব সম্পন্ন। আমরা খেলাকে ভালবাসি। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, সুরুচিপূর্ণ পত্রিকা 'খেলার আসরে' যেন খেলাধূলার আলোচনাই বিশেষভাবে স্থান পায়। যার মাধ্যমে আমরা কিছু নতুনত্বের স্বাদ পেতে ও জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি,
জালান নগর (ভুলী), ধানবাদ।

দুঃখজনক

ষোল নভেম্বর সংখ্যায় পুষ্প শরাফের লেখা 'অমল দত্ত কি রহমানের পথেই যাবেন', পড়লাম এবং মহমেডান সমর্থক হিসেবে মর্মাহত হলাম। যে হাবিব ছিলেন আমাদের গুরু। যাকে আমরা সব থেকে বেশি শ্রদ্ধা করতাম সেই তিনি এমন ব্যবহার করবেন আশা করিনি। ১৯৭৯ সালে অশোক চক্রবর্তীকে ক্যাপ্টেন্সি থেকে বঞ্চিত করে, হাবিবকে অধিনায়ক করে সম্মানিত করা হলো। অথচ হাবিব ক্লাবকে এবং সমর্থকদের এত বড় আঘাত দেবেন, আমরা একদম ভাবতে পারিনি।

ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন তাকে শাস্তি দেওয়া হোক।

কোচ অমলদাকে অভিনন্দন জানাই দিল্লিতে নির্ভীক টিম গঠন করে যোগ্য কোচের ভূমিকা নেবার জন্য।

অনুপ দাস,
ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

চুঁচুড়ায় স্টেডিয়াম হচ্ছে না কেন?

আমরা চুঁচুড়ার অধিবাসী। আমাদের এখানে তিনটি বড় মাঠ রয়েছে। এখানে স্টেডিয়াম করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও এখনো এখানে স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি। প্রতি বছর লিগ খেলা হয় এবং তা খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়। এবছর লিগের শেষ খেলা বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে রাজেন্দ্র স্মৃতি সংঘের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু খেলা শেষ হবার ১৫ মিনিট আগে দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খোলা মাঠে চারদিক ঘিরে দর্শকরা থাকার দরুণ খেলোয়াড়রা প্রথম থেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল। অথচ মাঠে পুলিশ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। আমাদের চুঁচুড়া শহরে এরকম ধরনের ঘটনাতে আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছি। এসব ঘটনা ঘটত না যদি স্টেডিয়াম থাকত। যদিও আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর বাবু এব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তবুও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই আমাদের অনুরোধ চুঁচুড়াতে যেন স্টেডিয়াম গড়ে ওঠে এবং তা হলে এভাবে খেলা আর পণ্ড হবে না। এব্যাপারে আমরা মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপঙ্কর মিত্র, দিবেন্দু মিত্র,
বাবুগঞ্জ, রথতলা, হুগলী, চুঁচুড়া।

খেলোয়াড় সমিতি হোক

সম্প্রতি খেলোয়াড় মহলে কথা উঠছে খেলোয়াড় সমিতি করা হবে। এরই একটি আভাস পাওয়া গেল যেদিন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা মিলিত হয়ে তরুণ বসুকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে পদক্ষেপ নিলেন। এ সম্বন্ধে আমার একটি নিজস্ব পরিকল্পনা আছে। এই সমিতির সভাপতি হবেন সুভাষ ভৌমিক। ময়দানের এই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ধান্দাবাজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিখ্যাত



হয়েছেন। সম্পাদক হবেন তরুণ বসু। তার মত স্পষ্টবাদী ও খেলোয়াড়-দরদী কমই আছে। এই সমিতির কার্যকরী সমিতিতে থাকবেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত, হাবিব, সুব্রত ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষ, সমরেশ চৌধুরী প্রমুখ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা এবং এদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন দু'জন ক্রীড়া সাংবাদিক ও খেলার আসর পত্রিকা। এই সাংবাদিকদের কলম দিয়ে খেলার আসর পত্রিকার মাধ্যমে চলবে অবিরত আপসহীন সংগ্রাম।

চয়নকান্তি ঘোষ,
হলদিবাড়ি, ভেলো কোচবিহার।

ধারাভাষ্য

বিগত কলকাতা টেস্টের ইংরাজী/হিন্দী ধারাভাষ্যে স্থানীয় কোনও পূর্বসূরী বিশেষজ্ঞের মর্যাদা পেলেন না, সে কি হিন্দী না জানা



থাকার অপরাধে? বাংলা ভাষাকার অজয় বসু কি হারিয়ে গেছেন? তার সুললিত কণ্ঠের সাবলীল ভাষ্য শোনা গেল না কেন? দূরদর্শনে তা-ও চাক্ষুষ ব্যাপার আছে, সেখানে ভাষ্যটা অতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু বেতারে যে ওই ভাষ্যটুকুই সম্বল, ওটা কি দুর্বল হলে চলে? শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য তো সুন্দর বলছিলেন; দুদিন পরে বাদ পড়লেন কেন?

সুব্রত সরকার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ব্যায়াম কেন অবহেলিত?

যেকোন খেলাধূলা করতে গেলে সবার প্রথমে চাই সুস্থ ও সবল শরীর। জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত 'খেলার আসরে' খেলাধূলার সব বিভাগই থাকে। ভলিবল, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্রিজ, হকি ইত্যাদি কোন খেলার বিবরণই বাদ যায় না, কিন্তু থাকে না সব খেলার জন্য যেটা প্রয়োজন সেই শরীর চর্চার কোন বিভাগ।

ভারতের সেরা ব্যায়ামবিদদের পীঠস্থান এই কলকাতা। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'খেলার আসরে' থাকে না কোন ব্যায়াম সম্বন্ধে রচনা। ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়মিত একটি বিভাগ খোলা হলে যারা শরীর চর্চা করে তারা উপকৃত হয়। মনতোষ রায়, মনোহর আইচ, সুনীল পাল কি অবহেলার যোগ্য?

বাপী ও বিহার চ্যাটার্জি,
খগোল, পাটনা।

গুলনাহারকে ধন্যবাদ

'দীন মহম্মদ সেখের' চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ৯/১১ তারিখে প্রকাশিত 'গুলনাহারের' চিঠি পড়ে বেশ ভাল লাগল। এই জন্য তাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 'সেন সাহেব, মুসলিম মেয়েদের 'বোরখা' পড়িয়ে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখার কথা বলেছেন, কিন্তু সত্যিই কি বর্তমান ক্রীড়া জগতে মুসলিম মেয়েরা অন্ধকার ঘরেই রয়েছেন? গুলনাহারের দেওয়া বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের নাম থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি (গুলনাহার) যে মুসলিম মেয়েদের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার লেখা পড়ে মুসলিম মেয়েদের অগ্রগতি সম্বন্ধে যারা এখনও ওয়াকিবহাল নন তারা নিশ্চয় সচেতন হবেন এবং ওই সমস্ত মহিলারা (যারা এখনও পর্দার আড়ালে রয়েছেন) তার পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবেন। তাদেরকে পথ দেখানোর দায়িত্ব তো আমাদেরই।

আশিক আমেদ, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ।

ছিল না

১৬ নভেম্বর সংখ্যা খেলার আসরে প্রকাশিত 'রাজ্য টেবল টেনিস রায়গঞ্জকে মাতিয়ে গেল' রচনাটিতে বিপ্লব তালুকদার মহাশয়ের একটি রিপোর্ট ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। বালকদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে দেবাশিস সাহা রাজীব সিংকে ৩-০ গেমে হারিয়ে। রচনাটিতে এই খবরটি ছিল না।

বাবু ধর, বিরাটি।

ভুল ধরতে ভুল

১৬ নভেম্বর সংখ্যায় 'পাঠকের কলমে' মুনমুন ব্যানার্জির লেখা 'ভুলের মাশুল কে দেবে' পড়ে একটু অবাক হলাম। উনি খেলার আসর পত্রিকার একটা সামান্য ছাপার ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই একটা মারাত্মক ভুল লিখে ফেলেছেন। কারণ অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলারের নাম 'হগস্' না, আসল নামটা হলো 'রডনী ম্যালকম হগ'।

প্রশান্ত মুখার্জি (রিস্কু),
রেলওয়ে সাউথ কলোনী, রাঁচি।

এবারের সেরা চিঠির জন্য পুরস্কার পাবেন স্টেশন রোড, মেদিনীপুরের সমীরণ মজুমদার



"আমার বাবা, নিজের টেনিস শ্যুতে চেরী ব্লস্‌ম্‌ হোয়াইট ক্লীনার ব্যবহার করেন। আর তাই দেখে আমিও করি.. সত্যিই দারুণ।"
—বলেন
প্রেমজিৎ লালের ছেলে দেব।
CHERRY BLOSSOM WHITE CLEANER FOR SPORTS SHOES
New pack! Contains 25% extra!
স্পোর্ট্‌স শু্য-তে চেরীব্লস্‌ম্‌ হোয়াইট ক্লীনার লাগালে তা' দেখতে হয় চোখ ধাঁধাঁনো সাদা...নতুনের মত। এই কারণেই দেবের মতন উদীয়মান টেনিস তারকা এবং তাঁর বাবা ও পৃথিবীর সমস্ত প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের চেরী ব্লস্‌ম্‌ হোয়াইট ক্লীনার চাই-ই চাই।
খেলার মাঠে নিজের ক্রীড়া-নৈপুণ্য গড়ে তুলতে প্রথমেই দরকার-সুপার হোয়াইট স্পোর্টস শু্য। আজই কিনুন চেরী ব্লস্‌ম্‌ হোয়াইট ক্লীনার। এখন এ্যাপ্লিকেটরযুক্ত বলে ব্যবহারে খুব সুবিধে।
চেরী ব্লস্‌ম্‌ হোয়াইট ক্লীনার
চোখ ধাঁধাঁনো সাদা স্পোর্ট্‌স শু্যর জন্য
LINTAS/CBWC/1/2417 BEN



জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সে সফল ত্রিপুরা দল প্রফুল্ল সরকার ট্রফি নিয়ে

জাতীয় জিমনাস্টিক্সে ত্রিপুরা ও বাংলাই নজর কাড়ল

অরুণাভ রায় ঃ বোম্বাইয়ে সদ্য সমাপ্ত ২২তম জাতীয় জিমনাস্টিক্সে পূর্বাঞ্চলের ছিল জয়জয়কার। বিশেষ করে ত্রিপুরা সিনিয়র বিভাগে এবং পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র বিভাগে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। নবাগত মণিপুর দলও ভাল ফল করেছে।

গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ন চণ্ডীগড়কে ১৩'৭০ পয়েন্ট পেছনে ফেলে পুরুষ বিভাগে ত্রিপুরা প্রথমবারের মত চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরে তুলে পেয়েছে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র সরকার মেমোরিয়াল ট্রফি। একটানা ১৫ বছরের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস দলকে পুরুষ বিভাগে তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ত্রিপুরা দলের মূল নায়ক ছিলেন আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট বীশ্বেশ্বর নন্দী এবং এন ভি ভোঁসলে, তাছাড়া দলে ছিলেন সমীর ভট্টাচার্য, আবদুল হোসেন, চামু সিং, নন্দলাল দেববর্মা, কে রাজেন্দ্রন। ত্রিপুরার সংগৃহীত পয়েন্ট—১৭৮.৮৫। অলরাউণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম স্থানটি পেয়েছেন বিশ্বেশ্বর নন্দী (৮৫.৭০ পয়েন্ট) দ্বিতীয় এন ভি ভোঁসলে (৭৬.৪০)। গত-বছর হায়দ্রাবাদ জাতীয় ক্রীড়ার চ্যাম্পিয়ন চণ্ডীগড়ের রথীন্দ্র রায় এবার সুবিধা করতে পারেননি। মাত্র ৬৯.৪০ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানটি পেয়েছেন। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ত্রিপুরার যারা স্থান পেয়েছেন তারা ঃ বিশ্বেশ্বর নন্দী পোমেলহর্সে প্রথম ১৪'৫০ পয়েন্ট, হরাই জেণ্টাল বারে দ্বিতীয় ১৪.৫৫ পয়েন্ট, প্যারালাল বারে তৃতীয় ১৩.৪৫ পয়েন্ট। সমীর ভট্টাচার্য প্রথম রোমান রিং-এ ১৪.১৫ পয়েন্ট, ভল্টিং হর্সে প্রথম ১৬.৫২৫ পয়েন্ট, এন বি ভোঁসলে প্রথম—প্যারালাল বার ১৫.১০ পয়েন্ট, হরাই-জেণ্টাল বারে প্রথম ১৬.৬৫ পয়েন্ট, কে রাজেন্দ্রন ভল্টিং হর্সে ১৬.০০ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। সমীর ভট্টাচার্য এবং রাজেন্দ্রনের মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল।

কুড়ি বছরের নীচের গ্রুপেও ত্রিপুরা ১৩৬.৩০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স হয়েছে সার্ভিসেস ১২০ ৪০ পয়েন্ট, পশ্চিমবাংলা পেয়েছে তৃতীয় স্থান (১১২.৮৫ পয়েন্ট)। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ত্রিপুরার স্বরণজিত সিং ৬৬.২০ পয়েন্ট। মণিপুরের ওয়াই ব্রিজেন সিং ৬৩'০০ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানটি পেয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা দলে ছিলেন স্বরণজিত সিং, গৌর নিতাই বণিক, মতিলাল পাল, বিমল ভৌমিক, দেবাশিস দামচৌধুরী, বিজয় সাহা। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ত্রিপুরার স্বরণজিত সিং পোমেল্ড হর্স হরাইজেণ্টাল বারে প্রথম হয়েছেন। তাছাড়া দেবাশিস. দামচৌধুরী হরাইজেণ্টাল বারে 'ডিসমাউণ্ট' (বারের উপর থেকে সার্কেল করে দুটি সামারসল্ট এবং তারপর ল্যাণ্ডিং) করে সবার নজর কেড়েছেন। দেবাশিস প্রথম ভারতীয় জিমনাস্ট যিনি হরাইজেণ্টাল বারে এত শক্ত একটি অ্যাকশন দেখালেন।

১৮ বছরের নীচের গ্রুপে পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্য প্রথম তিনটি স্থান দখল করে।

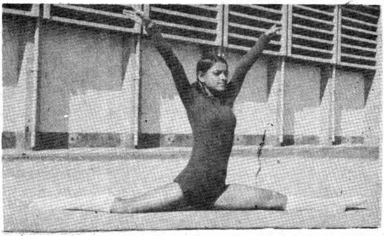


পশ্চিমবঙ্গ ১৩৮'০০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ত্রিপুরা রানার্স। নবাগত মণিপুর তৃতীয় স্থানটি দখল করে নেয়। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্জন দাস ৬২.৩০ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছেন ওড়িশার বীরঞ্জন বেরা এবং সৈয়দ জবিউল্লা। প্যারালাল বারে প্রথম তিনটি স্থানই ত্রিপুরার জিমন্যাস্টরা দখল করে নেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানগুলি পেয়েছেন যথাক্রমে নির্মল সাহা, বিজয় সিংহ রায় এবং গৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল। ১৮ বছরের নীচের গ্রুপে পশ্চিম বাংলার অঞ্জন দাস দারুণ কঠিন অ্যাকশন দেখিয়েছেন বিভিন্ন অ্যাপারাটাসে। 'অর্জুন' পুরস্কার বিজয়ী মণ্টু দেবনাথ অঞ্জন দাসের সম্পর্কে ভীষণ আশাবাদী।

বালক বিভাগে ১৪ বছরের নিচের গ্রুপে পশ্চিমবঙ্গ ৮৯.৫৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন-শিপ পায়। ত্রিপুরা ৮৪.৭৫ পয়েন্ট পেয়ে রার্নাস। মণিপুরের ডাবেলইউ, ইনোবি সিং ৪৫.১৫ পয়েন্ট ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের বিভাগে পাঞ্জাব ৭৭.৬৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন। ত্রিপুরার মেয়ে বর্তমানে গোয়ালিয়রের ন্যাশনাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে মাস্টার ডিগ্রি পাঠরতা কল্পনা দেবনাথ এবার প্রতিযোগিতা করেছেন মধ্য প্রদেশের হয়ে। কল্পনা এই নিয়ে পর পর পাঁচ বার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন।

বালিকাদের কুড়ি বছরের নীচে পশ্চিম-বঙ্গকে ৯.৩০ পয়েণ্টে পেছনে ফেলে ত্রিপুরা চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে। ত্রিপুরা দলে ছিলেন রীণা মজুমদার, রত্না ভৌমিক, উমা দত্ত, কাবেরী দেববর্মা, সোমা দত্ত, হালেমা চৌধুরী। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপেও প্রথম



২০ বছরের নিচে চ্যাম্পিয়ান রীণা মজুমদার

চারটি স্থান পেয়েছেন ত্রিপুরার জিমন্যাস্টরা। ৩৭.৪০ পয়েন্টে রীণা মজুমদার প্রথম, রত্না ভৌমিক দ্বিতীয়, উমা দত্ত তৃতীয়, কাবেরী দেববর্মা চতুর্থ। প্রত্যেকটি অ্যাপারাটাসে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথম। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রীণা মজুমদার ভল্টিং হর্স (১২.৫০ পয়েন্ট), ফ্লোর একসারসাইজ (১২.৫৫), আনইভন বার (৯.৫০) প্রত্যেকটি বিভাগেই প্রথম। তাছাড়া রীণাই ভারতীয় জিমন্যাস্টদের মধ্যে প্রথম আনইভেন বারে 'shot-up' সামারসল্ট ডিসমাউন্ট করেছেন। ভল্টিং হর্সে হ্যাণ্ড স্প্রিং সামারসল্ট একটা নতুন অ্যাকশন।

১৪ বছরের নীচের বালিকাদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ৬৯.০৫ পয়েন্ট পেয়ে। এই বিভাগে ত্রিপুরা সুবিধা করতে পারেনি। ত্রিপুরার স্থান ছিল পঞ্চম। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম স্থানটি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্জুরাণী দে। তার সংগ্রহ ৩৫.২৫ পয়েন্ট। জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক দিলীপ সিং অজুর ভীষণ প্রশংসা করলেন। এই বিভাগে মহারাষ্ট্রের মেয়েরাও ভাল করেছে।

এবারকার জাতীয় প্রতিযোগিতা থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে পাকিস্তান সফর এবং আসন্ন এশীয় যুব জিমন্যাস্টিক্স এবং ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসের জন্য। আগামী মাসে পাতিয়ালার এন আই এস ক্যাম্প শুরু হবে।

ছবি : তপন সেন

আসামকে ইনিংসে হারিয়ে বাংলার পুরো পয়েন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : কটকে রঞ্জি ট্রফির প্রথম খেলায় ওড়িশার বিপক্ষে সরাসরি জয় না পেলেও বাংলা ইডেনে দ্বিতীয় ম্যাচে আসামকে ইনিংস ও ১১ রানে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। এই আসামকে বাংলা গতবার হারিয়েছিল মাত্র দুই উইকেটে।

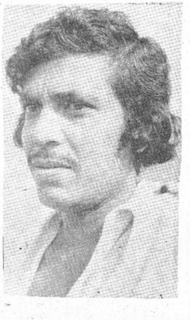
তৃতীয় দিন লাঞ্চের ঘন্টাখানেক বাদেই খেলা শেষ হয়ে যায়। বৃষ্টির জন্য পিচ ও আউট ফিল্ড ভিজে থাকায় প্রথম দিন মাত্র ৮৭ মিনিট খেলা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় রঞ্জি ট্রফি লিগের শেষ ম্যাচটি বাংলা খেলবে বিহারের বিপক্ষে জামাডোবায় ডিসেম্বরের ১৫, ১৬ ও ১৭ তারিখে। ওড়িশার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে বাংলা পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছে, আসামের সঙ্গে পেল পুরো আট পয়েন্ট।

ওড়িশার অধিনায়ক নন্দন বেজবোড়া টসে জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠান। খেলা শুরু হয় চায়ের পরে। প্রথম দিন পলাশ নন্দীকে খুইয়ে বাংলার হয় ৭৪ রান।

দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের ৫৫ মিনিট পর বাংলার ৬ উইকেটে ২৫৫ রান উঠলে অধিনায়ক রাজু মুখার্জি ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান মাইকেল দালাভির ৭০। রাজু করেছেন ৩০ এবং উদয়ভানু ব্যানার্জি ২৬। ১৯৮ রানে পঞ্চম উইকেট পড়ার পর লড়াকু অলোক ভট্টাচার্য খেলতে নামেন। তিনি এবং প্রণব নন্দী ষষ্ঠ উইকেটে মাত্র ২৩ মিনিটে ৫৭ রান যোগ করেন। যার মধ্যে অলোকের সংগ্রহ ৩৬। প্রকৃতপক্ষে অলোক এই সময়টায় আসাম বোলারদের সঙ্গে ছেলেখেলা করেছেন। উইকেটে এসেই মারমুখী; বেপরোয়া ব্যাট চালাতে গিয়ে দুবার ক্যাচও তোলেন। কিন্তু আসাম ফিল্ডাররা তা ধরে রাখতে পারেননি।

আসামের বোলারদের মধ্যে একমাত্র রিয়াজুল হক কিছুটা নজরে পড়েছেন। ২৮ ওভারে ৮৮ রান দিয়ে তিনি তিনটি উইকেট পান।

২৫৫-র উত্তরে আসামের প্রথম ইনিংসটি মাত্র ১০১ রানেই গুটিয়ে যায়। একমাত্র অরূপ গোস্বামী এবং কিছুটা মুকুট দাস ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যানই উইকেটে দাঁড়াতে পারেননি। ছয়টি চার দ্বারা ৯৭ মিনিটে ৪৩ রান করে অরূপ দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হয়ে যান, মুকুট করেন ২৫।



অলোক ভট্টাচার্য—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় / অরুণ মুখার্জি

বাংলার পক্ষে প্রথম দফায় সর্বাধিক সফল বোলার অবশ্যই অলোক ভট্টাচার্য এবং হায়দার আলি।* আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র নিয়ে হায়দার এবারই এখানে আসেন। অলোক ১১ ওভারে ১৯ রান দিয়ে তিনটি উইকেট পেয়েছেন, হায়দারকে তিনটি উইকেটের জন্য খরচ করতে হয়েছে ৩৪ রান। দুটি উইকেট পেয়েছেন বরুণ বর্মন। অরূপ গোস্বামী ছাড়া আসামের আরও একজন ব্যাটসম্যান—এম কামার—রান আউট হয়েছেন।

তিনদিনের ম্যাচে ফলো অন করাতে হলে ব্যবধান দরকার ১৫০ রানের। ১৫৪ রানে পিছিয়ে থাকায় আসাম সেই বিধানে পড়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪৩ রানে আসাম ফুরিয়ে যায়। এবং এবারও কোন ব্যাটসম্যানই উইকেটে টিকে থাকতে পারেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম গৌতম দাস। আসামের ওই ওপেনারটি প্রথম দফায় ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে অটল প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ৬৩ রান করেন (পাঁচটি চার)। সূচনা করতে নেমে শেষপর্যন্ত ব্যাট করে যাওয়া অবশ্য ক্রিকেটের একটি বিরল নজীর। গৌতম সেই নজীরের অংশীদার হলেন।

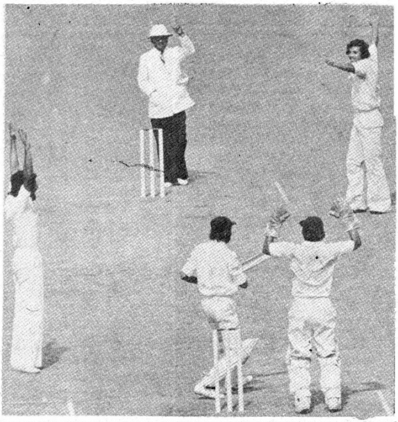
বাংলার পক্ষে এবারও সর্বোচ্চ উইকেটের দখলদার অলোক ভট্টাচার্য। অলোক এই মুহূর্তে

শুধু বাংলা দলেই অপরিহার্য নন, দেশের পক্ষে খেলার সম্ভাবনাময়দের তালিকায়ও তিনি চলে এসেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ১০ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে অলোক তিনটি উইকেট পেয়েছেন। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন হায়দার আলী, প্রণব নন্দী এবং সুব্রত পোড়েল। সুব্রতকে ১৯ ডিসেম্বর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত-পাক তৃতীয় টেস্টের বিরতি দিনে ট্রায়ালে ডাকা হয়েছে আরও কয়েকজন বোলারের সঙ্গে। বাকি উইকেটটি পেয়েছেন উদয়ভানু।

নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান পলাশ নন্দী গতবার দল থেকে বাদ পড়েছিল। এবার আবার তাকে টিমে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, ডাকা হয়েছে সম্বরণ ব্যানার্জিকেও। বাংলা দলে আবার সুযোগ পেয়ে সম্বরণ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উইকেটকিপিং করেছেন। এই ম্যাচে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেওয়া একটি অসাধারণ ক্যাচ এবং দুটি স্টাম্প ওর যোগ্যতারই স্বীকৃতি।

গতবারের বাংলা দলের তুলনায় এবারের টিম শক্তিশালী এবং ব্যালেন্সও। যোগ্য অধিনায়ক রাজুর নেতৃত্বে বদ্ধপরিকর মন নিয়ে লড়লে এবারের রঞ্জিতে বাংলার আরও বড় সাফল্য আশা করা যায়।

বাংলা : আসাম—অলোক ভট্টাচার্যের বলে অরুপ গোস্বামী এল বি ডবলিউ / তরুণ মুখার্জি



বিহার বাংলাকে বেগ দিতে পারে

জামাডোবা থেকে অমল ত্রিবেদী : ধানবাদের ডিগওয়াডি স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চল রণজি ট্রফি ক্রিকেটের লিগ ম্যাচে বিহার আসামকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১৬২ রানে হারিয়েছে। অবশ্য নানা কারণে আসামের কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড় এ ম্যাচে খেলেননি।

আসামের হার কোন বিশেষ খবর নয়, কিন্তু বিহার এবার অন্যান্যবার অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী এটা ঠিক। ব্যাটিং, বোলিং ও সর্বোপরি ফিল্ডিং-এ তারা এবার বাংলাকে টেক্কা দিতে পারে। বিহারের বোলিং-এর প্রধান অস্ত্র মিডিয়াম পেস বোলার শেখর সিনহা ও আশিষ সিনহা এবার আরো অনেক পরিণত। সেই সঙ্গে এম আর ভাল্লা, ভেংকট্রাম ও যোধ সিং-এর স্পিন বোলিং—এর ধার আছে। দলনায়ক রমেশ সাকসেনা এত বয়সেও ভাল খেলছেন শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। সার্থক নেতৃত্ব তিনি এবছর আসামকে বিপর্যস্ত করে ছেড়েছেন। বাংলার বিরুদ্ধে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারবেন বলেই মনে হয়।

বিহারের দুই মিডিয়াম পেস বোলারের মধ্যে শেখরকে আশিষ অপেক্ষা আরো দ্রুত গতিতে বল করতে দেখেছি এবার। বিরাট চুল ও দাড়ি গোঁফ নিয়ে তিনি উইকেটের দিকে ছুটে এসে ব্যাটসম্যানকে ভয় পাওয়াতে চান। আশিসের বাউন্সারও এবার অনেক বেশি ধারালো।

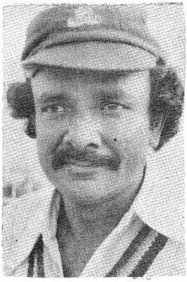
বিহার আসামের খেলায় দু'দলের শক্তির তারতম্য ছিল আকাশ পাতাল। টসে জয়ী হয়ে বিহার আসামকে ব্যাট করতে পাঠায়। রমেশের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন আসামের খেলোয়াড়রা ঘড়ির চেয়ে দ্রুতগতিতে প্যাভিলিয়নে আসা যাওয়া শুরু করেন। লাঞ্চের সামান্য আগেই আসাম শিবিরে ধস নামিয়ে দিলেন শেখর (৩৫ রানে ৬ উইঃ), আশিস (২২ রানে ২ উইঃ) এবং ভেংকটরাম (এক ওভার বল করে কোন রান না দিয়ে ২ উইকেট)। দলের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করেন রিয়াজুল হক ৩৩। আসাম ৭৮ ও পেনালটি রান ১২ নিয়ে প্রথম ইনিংসে মোট ৯০ রান পায়।

বিহার খেলতে এসেই মাঠে রানের বন্যা বইয়ে দেয়। বিহার দ্বিতীয় দিনের শেষে যখন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলো তখন তাদের ঝুলিতে সংগ্রহ হয়েছে মোট ৩৫৫ রান, এজন্য তাদের তিনজন ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পেরেছেন আসামের নরেন সন্ত পণ্ডিত ও নাগেশ সিং। বিহারের পক্ষে সর্বোচ্চ রান তুলে হরি গিদওয়ানি অবসর নেন। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ১০০। ১৬টি চার ও একটি পাঁচ রানের মার আছে এতে। ওপেনার সুব্রত দাস ৭৯, ভিকটর যোশেফ ৫৯, রমেশ সাকসেনা ৩২ রান করেন। অপরাজিত ব্যাটসম্যান রবীন মুখার্জি ও যোধ সিং যথাক্রমে ৫০ ও ২৪ রান করেন। যোধ সিং-এর একটি বল মাঠ পার হয়ে লোকালয়ে গিয়ে পড়ে। বিশাল দেহী এই শিখ যুবকটির হাতে ভাল মার আছে, কিন্তু বড় বেশি স্লো। উইকেটের মধ্যে ছোটার সময় ও ফিল্ডিং করার সময় যেন তার গায়ে জ্বর আসে।

আসাম দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে আবার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আসা-যাওয়ার পালা যখন ফুরোল তখন দিনের টি'-এর আরো ৪০ মিনিট বাকি। এবং তাদের সংগ্রহ মোট ১০৩। শেখর, আশিষের সঙ্গে এবার বিপক্ষের ধস নামাতে সাহায্য করলেন ভেংকটরাম (৪২ রানে ৩ উইঃ)।

শেখর ও আশিস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পান ১০ ও ১৬ রানের বিনিময়ে। আসামের সর্বোচ্চ স্কোর করেন পাঞ্জাবী তরুণ স্পিনার নাগেশ সিং ৩৫। আসামের এই একটি মাত্র ছেলে ডিগওয়াডির দর্শকদের মাতিয়ে গেছেন। নাগেশ জোরহাট জে বি কলেজের ছাত্র। চমৎকার ফ্লাইট রেখে বল করেন। সুযোগ পেলে ও আসামকে অনেক কিছু দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস। নাগেশের পর আসামের আর যে দুজন খেলোয়াড় দলের বেশি রান করেছেন তারা কল্যাণ দত্ত ২২ ও দীপক বরগোহাইন ২১।

বিহার এই জয়লাভের সূত্র ৮ ও একটি বোনাস পয়েণ্ট সহ মোট ৯ পয়েণ্ট পেল। ওড়িশার সঙ্গে খেলার পর এই মাঠে বাংলার মুখোমুখি হতে হবে বিহারকে। সেজন্য এখানে সাজ সাজ রব পড়েছে ইতিমধ্যেই।●



হায়দার আলি এবারে বাংলার হয়ে খেলছেন / অরুণ মুখার্জি

এম বেজবড়ুয়া রান করেন ২৯, তিনিই টপ স্কোরার।

চা-পানের বিরতির ১০ মিনিট আগে ওড়িশা ব্যাট করতে আসে ও দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৮৬ রান করে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে করণ দুবে ও রবি পাণ্ডে দুজনেই ৪০ রান করেন ও পাণ্ডা অপরাজিত থাকেন। পরদিন পাণ্ডা তার অর্ধশত রান পূর্ণ করেন। ওড়িশার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৬৪ রানে। আসামের নরেন সিং ৪৭ রানে ৬টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসেও আসাম দল পরমজিত সিং-এর স্পিনের মোকাবেলা ঠিক মত করতে পারে না ও ১৩৮ রানে ইনিংস শেষ করে। পরমজিত দু'ইনিংসে ৭২ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য ৮০ রান প্রয়োজন এ অবস্থায় খেলতে নেমে ওড়িশা দল প্রথম থেকেই দ্রুত হারে রান তোলা শুরু করে ও ৮৭ মিনিটে ৩ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। করণ দুবে ৭টি বাউণ্ডারি৫০ রানে অপরাজিতথাকেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ আসাম প্রথম ইনিংস ১০৫ ও দ্বিতীয় ইনিংস ১৩৮। ওড়িশা প্রথম ইনিংস ১৬৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৮০।

বাংলার কাছ থেকে ওড়িশার তিন পয়েণ্ট

কটক থেকে বরেন্দ্র ঢল ঃ নিতান্তই ভাগ্যবলে বাংলার কাছ থেকে ওড়িশা তিনটি মূল্যবান পয়েণ্ট পেয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর বাংলা-ওড়িশা রঞ্জি ট্রফি লিগ ম্যাচের শেষ-দিনের শেষ ওভারে উদয়ভানু ব্যানার্জি পরপর ২জন ওড়িশা ব্যাটসম্যানকে আউট করলেও শেষ ব্যাটসম্যান রণধীর সিং শেষ ২টি বলে টিকে যান। ফলে ম্যাচটি ড্র হয় এবং প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে বাংলা পাঁচ পয়েণ্ট পায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ বাংলা ২৭৭ ও ৫ উইঃ ১৭৬ ডিক্লেয়ার্ড।

ওড়িশা ২১১ ও ৯ উইঃ ১০২।

বারবাটি স্টেডিয়ামের এই ম্যাচে বাংলা সব বিভাগেই প্রাধান্য দেখালেও শেষ পর্যন্ত পুরো পয়েণ্ট পেল না ভাগ্য বিরূপ বলে। ওপেনার পলাশ নন্দী (৮০), উদয়ভানু ব্যানার্জি (৫৭), প্রনব নন্দী (৪১) প্রথম ইনিংসে ব্যাটে সফল হন। ওড়িশার ওপেনার করণ দুবে (৬২) ও তিন নম্বর ব্যাটসম্যান সুধীর পাঠকের (৪২) দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত ওড়িশা মোটামুটি ভাল রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় তথা শেষ দিনে সকালে ত্রিশ মিনিট পর থেকে বাংলা দ্বিতীয় দফার ব্যাট শুরু করে। অধিনায়ক রাজু মুখার্জির নির্দেশে দ্রুত রান নিয়ে মাত্র ৪৩ রানে বাংলা তিনটি উইকেট হারালেও মাইকেল দলভি (৫৬) ও উদয়ভানু ব্যানার্জি (৫১ ন আ) বাংলাকে জয়ের মতো রান এনে দেয়। এবার বোলারদের দায়িত্ব।

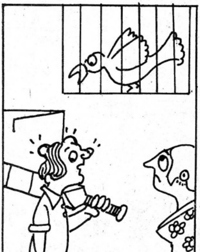
বাধ্যতামূলক ওভার যখন শুরু হলো তখন ওড়িশার দ্বিতীয় দফার স্কোর ৩ উইকেটে ৪১। আরও ছ'ওভারের মধ্যে স্কোরবোর্ডে ১৭ রান জুড়ে আরও তিন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফেরত গেলেন। সপ্তম উইকেটে গৌতম নাগ ও পরমজিৎ সিং ঠেকা দেন ১২ ওভার পর্যন্ত। অনিল ভরদ্বাজকে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে ব্যাট করতে নামতে হয়। শেষ ওভারের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বলে উদয়ভানু ব্যানার্জি, ভরদ্বাজ ও নবাগত সুধীর হুসেনকে আউট করলেও শেষ ২টি বল উইকেটের অনেক বাইরে দিয়ে যাওয়ায় শেষ ব্যাটসম্যান রণধীর সিংকে ব্যাট তুলতেই হয়নি।

এই ম্যাচে এখানকার দর্শকরা আবার অনেক আশা করে অলক ভট্টাচার্যর স্টাইলিস ব্যাটিং দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অলক দর্শকদের হতাশ করেছেন।

আসামকে ওড়িশা হারাল সাত উইকেটে

ওড়িশা ও আসামের রঞ্জি ট্রফির খেলা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে শেষ হল ২৪ নভেম্বর। খেলায় ওড়িশা হারিয়েছে সাত উইকেটের ব্যবধানে আসামকে।

প্রথম দিনে টসে জিতে আসাম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ওড়িশার অধিনায়ক পরমজিত সিং-এর স্পিন আক্রমণে মাত্র ১০৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। পরমজিত ২৯ ওভার বল করে ৩৩ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট পান। আসাম দলের অধিনায়ক



কার্টুন ঃ পিজি

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায়   রেখা : জি সান্তা   ৩০



মুসলমান মেয়েরা খেলাধূলায় পিছিয়ে কেন ?

কাজী মুরশিদুল আরেফিন : গত এক দশকের মধ্যে খেলাধূলার ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সাফল্য থেকেই বোঝা যায়, পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও এখন খেলার মাঠে যথেষ্ট এগিয়ে চলেছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, ভলিবল, বাস্কেটবল, কবাডি, সাইক্লিং, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স সব কিছুতেই মেয়েরা এখন ক্রীড়ারসিকদের কাছ থেকে যোগ্যতার স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন। কিন্তু, এই সাফল্য প্রধানত বাঙালী হিন্দু মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একমাত্র নাফিসা আলি বাদে আজকের ইলা পাল, মধুমিতা গোস্বামী, রীতা সেন, লক্ষ্মী সিকদার, শ্রীরুপা বসু শান্তি মল্লিক, এমনি আরো অজস্র হিন্দু মেয়ের নাম উল্লেখ করা যায়—যারা ক্রীড়াজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। এমন কি, এদের মধ্যে অনেকের রেকর্ড গড়তেও বাকি নেই।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েরা এত এগিয়ে আছেন, অথচ মুসলমান মেয়েরা এখনো দারুণভাবে পিছিয়ে রয়েছেন কেন ? সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত রক্ষণশীলতার বাঁধন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যে তারা বোরখা এবং পর্দা প্রথার নিষ্ঠুর অন্ধকারে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন। স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ পাওয়াও এখনো বহু মুসলমান মেয়ের কাছে স্বপ্নাতীত বিষয় হয়ে রয়েছে। সুতরাং, খেলাধূলার ক্ষেত্রেও তারা স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। প্রায় গৃহবন্দী অবস্থায় অধিকাংশ মুসলমান মেয়ের সমস্ত প্রতিভা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। অথচ এ বিষয়ে কারও যেন মাথাব্যথা নেই। সমাজের এক শ্রেণীর মেয়েরা যখন জীবনের বিচিত্র পথে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছেন, তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েরা এক অসহায় কোণঠাসা পরিস্থিতির মধ্যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন ধারাবাহিকভাবে। এ বিষয়ে কয়েকজন মুসলমান তরুণীকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। এদের মধ্যে কয়েকজন মহকুমা অথবা জেলা স্তরের খেলাধূলায় কিছুটা সাফল্য দেখাতে পেরেছেন এবং নানারকম পুরস্কার অর্জন করেছেন। যদিও তাদের কৃতিত্বের সবটুকুই প্রতিভার অপমৃত্যু বলা চলে। কেননা. পরিবেশ—পরিস্থিতির চাপে তারাও ক্রমশ অন্তরালে চলে যাচ্ছেন আরো দশটা সাধারণ মুসলমান মেয়ে কিংবা গৃহবধূর মতো।


সুফিয়া সুলতানা

কিন্তু, মুসলমান মেয়েরাও যে এখন আর শুধুমাত্র পর্দার আড়ালে জীবন কাটিয়ে নিঃশেষ হতে চায় না, চব্বিশ পরগণার সায়েস্তানগরের সতেরো বছর বয়সী মেয়ে সুফিয়া সুলতানাকে দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইছামতী নদীর ওপারে আপাতঃবিচ্ছিন্ন এবং সাধারণ একটি গ্রামে সুফিয়াদের বাড়ি। বাড়ির সামনে রাস্তা। কাছেই খেলার মাঠ। সুফিয়া প্রতিদিন সকাল বিকেল ওই রাস্তা এবং মাঠে ছোটবেলা থেকে নিয়মিত সাইক্লিং প্র্যাকটিস করে,এখন বসিরহাট মহকুমার প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার ক্ষেত্রে নিজের নামটি অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শারীরিক দক্ষতা আর প্রাণশক্তির অটুট মনোবল নিয়ে সে গ্রামে বসেও একজন বড় সাইক্লিস্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। সুফিয়ার বাবা আবদুল জিয়াদ সাহেব স্কুলের শিক্ষক। মনে-প্রাণে পুরোপুরি প্রগতিশীল। সুতরাং, তিনি চান মুসলমান মেয়েরা ঘরের মধ্যে বন্দী না থেকে জীবনের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়ুক। তাই, নিজের মেয়েকে খেলাধূলার আসর থেকে পুরস্কার কুড়িয়ে আনতে দেখলে জিয়াদ সাহেবের বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। সুফিয়ার দিদি রেহানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট তরুণী। তিনিও চান গ্রামের মুসলমান মেয়েদের খেলাধূলার ব্যাপক প্রসার।

পারিবারিক ক্ষেত্রে সবার উৎসাহ আর প্রেরণাকে মূলধন করে সুফিয়া প্র্যাকটিস করে চলেছেন সাইকেলে। সুফিয়া বললেন সাধারণভাবে চলাফেরার জন্যে যেসব দেশীয় সাইকেল ব্যবহার করা হয়, তা দ্রুত চালনার ক্ষেত্রে খুব বেশি সহায়ক নয়। অথচ বিদেশ থেকে রেসিং সাইকেল আমদানী হওয়ার পরে শুল্ক সমেত এদেশে তার যা দাম পড়ে, তা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে কেনা অসম্ভব। উপযুক্ত সাইকেলের অভাব ছাড়াও গ্রাম-গঞ্জে ভালো প্রশিক্ষকের ভীষণ অভাব। কলকাতায় গিয়ে কোন নামী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে আসাও সম্ভব নয়। ভালো ট্র্যাকের অভাবেও গ্রামের মেয়েরা খেলাধূলায় অংশ নিতে এগিয়ে আসতে পারে না। সুফিয়া ক্ষোভের সঙ্গে বললেন মুসলমান মেয়ে হিসেবে আমার সাইক্লিং অনুশীলনকে অনেকেই সমালোচনা করেন মাঝে মাঝে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি।

চব্বিশ পরগণার কাটিয়াহাট বি কে এ পি গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সুফিয়া সুলতানা গত বছর সাইকেল চালনার প্রথম পুরস্কারগুলি ছাড়াও অ্যাথলেটিক্সে মোট সাতটি ইভেন্টে নাম দিয়ে বহু প্রতিযোগিনীর মধ্য থেকেও কুড়িয়ে নিয়েছে সাতটি বড় পুরস্কার। সুফিয়া বললেন আমাদের দেশে এত কারিগরী উন্নতি হচ্ছে, অথচ সাইক্লিস্ট ছেলেমেয়েদের কথা বিবেচনা করে কোন দেশীয় কোম্পানি অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সস্তায় ভালো রেসিং সাইকেল প্রদানের ব্যবস্থা করে না কেন ? আমাদের পক্ষে তিন-চার হাজার টাকা দাম দিয়ে বিদেশী সাইকেল কিনে প্র্যাকটিস করার স্বপ্ন দেখা কি সহজ কথা ?

চব্বিশ পরগণার খোলাপোতা প্রাণকৃষ্ণ হালদার জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রী সাহানারা বেগমের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখন তার বয়স সতেরো। চোদ্দ বছর বয়সে অষ্টম শ্রেনীতে পড়ার সময় সাহানারা মহকুমাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের পর্দা প্রথার অন্ধকারাচ্ছন্ন গণ্ডি পার হয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে খেলাধূলায় নানারকম সাফল্য অর্জনের সূত্রে আশপাশের মানুষজনকে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছিলেন।

স্কুলের খেলাধূলা এবং নানাবিধ অনুষ্ঠানের আসর বসা মানেই সাহানারার ওপর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়া। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কয়েকটি বড় পুরস্কার পাওয়ার পর সাহানারা তার দিদির পরামর্শে এবং মায়ের অনুপ্রেরণায় বসিরহাট ২নং ব্লক উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত পঞ্চায়েতীরাজ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল ক্রীড়া উৎসবের একশ মিটার দৌড়ে নাম দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সে মাত্র সতেরো সেকেণ্ড সময় নিয়েছিলেন। এছাড়া, লংজাম্পে সাহানারা বারো ফুট চার ইঞ্চি অতিক্রম করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার কুড়িয়ে নিয়ে সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন। রিলে রেস ইভেন্টেও সাহানারা বেগমের অসাধারণ ক্রীড়া

দক্ষতার ফল হিসেবে তাদের গ্রুপ প্রথম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের ধারায় মেয়েটি আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারলেননা। ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেল এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মেয়ে হিসেবে সাহানারা খোলাপোতা অঞ্চলে যে শুভ উদ্যমের সূচনা করলেনি তা এমনভাবে বিফল হয়ে যাওয়ায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রেবা সেন অত্যন্ত হতাশ হয়েছেন। তিনি বললেন, প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুযায়ী গ্রামাঞ্চলের বহু মুসলমান মেয়ের এখনো অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। তারা অনেকে পড়াশুনাও বন্ধ করে দেয়। বিয়ের পরে খেলাধূলা করার স্বপ্ন দেখা মুসলমান মেয়েদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং, খেলাধূলার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের পিছিয়ে থাকার এটিও একটি বড় কারণ।

বারাসাত মহকুমার সোহাই কুমারপুরের সৈয়দ দাউদিয়া জুনিয়র গার্লস হাই মাদ্রাসার শিক্ষিকা কাজী রিজিয়া বেগম একজন আধুনিকা তরুণী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। মুসলমান মেয়েরা সমাজের কাছে এখনো অবহেলিত অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকায়, তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, স্কুল বা মাদ্রাসার মাধ্যমেও মেয়েদের খেলাধূলার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেরই মাঠ নেই, উপযুক্ত প্রশিক্ষক থাকেন না, স্কুলের কর্তৃপক্ষও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেন না। সব মিলিয়ে খেলাধূলার পরিবেশের দারুণ অভাব। মাদ্রাসাগুলিতে এই সংকট আরও বেশি। সেখানে মেয়েরা ভীষণ পর্দানশীন। খেলার প্রতি তাদের আদৌ ভালোভাবে উৎসাহ দেওয়া হয় না। শারীর শিক্ষার যেটুকু তালিম দেওয়া দরকার তাও যথাযথভাবে শেখানোর মতো উপযুক্ত ইনস্ট্রাক্টর না থাকায় মাদ্রাসার মেয়েরা এখনো বৃহত্তর ক্ষেত্রে ক্রীড়াচর্চার কথা ভাবতেই পারে না।

রিজিয়া বেগম আরও বললেন, বহু রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারের মুসলমান ভদ্রলোককে জানি, যারা মাদ্রাসায় খেলাধূলা প্রসারের পক্ষপাতী নন। তারা মনে করেন, এর ফলে মাদ্রাসার শালীনতা এবং পবিত্রতা নষ্ট হবে। কিন্তু এইসব ধারণা নেহাতই ভ্রান্ত মনে করি। মাদ্রাসায় মেয়েদের জন্যে যোগব্যায়াম, জিমন্যাস্টিক, অ্যাথলেটিক্স, ক্যারম, টেবল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, খো-খো, কবাডি ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় খেলাধূলার ব্যবস্থা ক্ষেত্রেও সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। মুসলমান মেয়েদের মধ্যেও যেসব ক্রীড়া প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে, তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। খেলাধূলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলে মুসলমান মেয়েদের মধ্য থেকে কুসংস্কারের প্রভাবও দ্রুত অপসারিত হবে বলে কাজী রিজিয়া বেগম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করলেন।


সাহানারা বেগম

মুসলমান মেয়েদের খেলাধূলা প্রসঙ্গে মুসলমান ছেলেরা কী ভাবছে, তা জানার জন্যে চব্বিশ পরগণার রঘুনাথপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আরিফুল ইসলামকে প্রশ্ন করেছিলাম। আরিফুল নিজে গোলরক্ষক হিসেবে খোলাপোতার নব জাগরণী সংঘের পক্ষে ফুটবল খেলেন। নাসির আমেদ ও শিবাজি ব্যানার্জির একনিষ্ঠ ভক্ত। আরিফুল বললেন মুসলমান মেয়েরা কি কাচের পুতুল যে খেলাধূলা করলেই তারা ভেঙে যাবে? অনেক স্কুলে খেলাধূলার ভালো পরিবেশ থাকলেও দেখা যায় মুসলমান মেয়েরা সেখানে বিশেষ অংশগ্রহণ করেননা। সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, এজন্যে অভিভাবকদের উৎসাহহীনতা এবং নিস্পৃহ মনোভাবই সবচেয়ে বেশি দায়ী। পারিবারিক পরিবেশ থেকেই মুসলমান মেয়েদের যদি উৎসাহিত করা না যায়, তাহলে তো মুসলমান মেয়েরা পিছিয়ে থাকবেই! অবশ্য সব মেয়েকেই ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল খেলতে হবে এমন কথা বলছি না। সাইক্লিং, সাঁতার, টেবল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, রাইফেল সুটিং ইত্যাদিতেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, সৈয়দ সুলতানা, নাফিসা আলি, ফৌজি খলিলি, সোফিয়া খাতুন প্রমুখ মুসলমান মহিলারা ক্রীড়ারসিকদের কাছ থেকে প্রচুর মর্যাদা পেয়েছেন। সুতরাং, ইতিহাসকে মনে রেখে আগামী দিনের মেয়েদেরও সেরকম ক্রীড়াদক্ষতার নজির গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে। এজন্যে ছেলেরাও মেয়েদের পাশে সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। এভাবে যৌথ উদ্যমেই গড়ে উঠতে পারে ক্রীড়াচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। আরিফুল ইসলাম সবশেষে বললেন, মুসলমান মেয়েদের পিছিয়ে থাকা মানেই সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের অনগ্রসরতা সম্পর্কে হিন্দু মেয়েরা কী ভাবছেন, এ সম্পর্কে দমদমের সরোজিনী নাইডু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী উর্মি রায়ের কাছে জিগ্যেস করেছিলাম। উনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়েছেন কয়েক বছর আগে। খেলাধূলায় আগ্রহী। বললেন, কলেজে পড়ার সময় কোন মুসলমান মেয়ের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত হয়নি—এটা খুবই দুঃখের কথা। স্কুল জীবন থেকেই অধিকাংশ মুসলমান মেয়ে এত বেশি সঙ্কোচে গুটিয়ে থাকে যে, কলেজে পড়ার সময় তারা কোন ব্যাপারেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে না। অথচ মুসলমান মেয়েরাও যদি খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে তাদের আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি চমৎকার আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ রচিত হবে সহজেই। হিন্দু মেয়েরা মুসলমান মেয়েদের জন্যে সব রকমের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। মুসলমান মেয়েরা একটু এগিয়ে এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। খেলাধূলাও যে সমাজ গঠন ও শিক্ষা প্রসারের অন্যতম বড় হাতিয়ার সেকথা মনে রেখে মুসলমান অভিভাবকদের আরো বেশি সংস্কার-মুক্ত এবং উদারচেতা হওয়ার প্রয়োজন আছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভুক্ত সবাই ক্রীড়াজগতে মুসলমান মেয়েদের অনগ্রসরতার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। সামাজিক সংস্কার এবং চিরাচরিত সঙ্কোচ কাটিয়ে মেয়েরা বোরখার আড়াল থেকে খোলা আবহাওয়ায় খেলার মাঠে নেমে আসতে পারলে প্রগতিশীল নারীচেতনার মূল্যায়ন করার কাজটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে খেলাধূলার ইতিহাসে মুসলমান মেয়েরা প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদাকে অধিকার করতে পারবেন স্বাভাবিকভাবেই। মুসলমান মেয়েরা যে সত্যিই কাচের পুতুল নন, সেকথা প্রমাণ করতে হলে সমাজের সবাইকে সচেতনতার সঙ্গে এখনই এগিয়ে আসতে হবে। কেবলমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সফল হতে পারে মুসলিম মেয়েদের আকাঙ্ক্ষিত নবজাগরণের সমস্ত সম্ভাবনা।


কাজী রিজিয়া বেগম

সি কে নাইডু ক্রিকেট রাউণ্ড রবিন পদ্ধতিতে হোক

পুনে থেকে নারায়ণ ঠক্কর ঃ এ দেশের ২২ বছরের কম বয়সী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ক্রিকেটাররা—যাদের মধ্যে অনেকেই নিকট ভবিষ্যতে রঞ্জি ট্রফি খেলার সম্ভাব্য দাবীদার, তারা আন্তঃ-আঞ্চলিক সি কে নাইডু ট্রফির খেলায় যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন অসময়ের বৃষ্টির জন্য।

সেমিফাইনাল রাউণ্ডে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের খেলার প্রথম দিনের পুরো সময়টাই ধুয়ে গেল অকাল বর্ষণে, একটা বলও সেদিন হয়নি। আর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় প্রথম দিনে ২০ মিনিটে মাত্র ৭·১ ওভার বল হয়। খেলা হয়নি, তাই ফাইনালিস্ট দল দুটিকে বাছাই হল শূন্যে পয়সা ছুঁড়ে ভাগ্য পরীক্ষায়। পূর্বাঞ্চলের ছেলেরা যে যার ঘরে ফিরলেন, একটিও ম্যাচ না খেলে।

পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের ফাইনাল খেলাতেও বৃষ্টি বাদ সেধেছে, তবে খেলা একেবারে বাতিল করতে হয়নি। এবারের সি কে নাইডু ট্রফি দেখে একটা কথাই মনে হয়েছে, তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান একাধিক পাওয়া গেলেও নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের খুবই অভাব।

এবারের প্রতিযোগিতায় অনুকূল উইকেটে মিডিয়াম পেসাররা কৃতিত্ব দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে নজরে পড়েছে পশ্চিমাঞ্চলের সুরেশ কেশওয়ালা ও হোসিদার কন্ট্রাক্টর, উত্তরাঞ্চলের রাকেশ জলি ও রাজেশ পিটার, দক্ষিণাঞ্চলের জয় সূর্য অভিরাম ও মধ্যাঞ্চলের বিকাশ গাভাতে। অপর দিকে স্পিনারদের মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক অশোক প্যাটেল ও উত্তরাঞ্চলের জীসান মহম্মদ ছাড়া বাদ বাকিদের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই দুই বোলার লাইন ও লেংথের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে একের পর এক উইকেট নিয়েছেন। ক্রিকেটের আরো বড় আসরে তাদের অচিরেই দেখা যাবে এমন আশা করা যায়।

বিশেষ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড় হিসাবে চোখে পড়েছে বোম্বের শ্রীধর মাণ্ডালে ও সুভাষ ক্ষীরসাগর, সৌরাষ্ট্রের রাজু বাদিয়ানি ও আলতাফ শেখ, গুজরাটের হর্ষকুঞ্জ সা ও বিমল সা, মহারাষ্ট্রের অবিনাশ সুগওয়েকার ও সুনীল গাভগে-কে।

প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় চন্দু বোরদের মতে এসব ছেলেরা তাদের কিছু কিছু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে ক্রিকেটের জাতীয় আসরেও হয়তো স্থান করে নিতে পারবে।

এটা দুঃখের বিষয় বোম্বের নির্বাচকমণ্ডলী এই ট্রফিতে যোগদানের নিয়মগুলো সম্বন্ধে বোধহয় ততটা ওয়াকিবহাল নয়। তাই নির্বাচনের পরও অধিনায়ক বাসুদেব তাম্বে, গিরীশ পাটকি ও গোলাম শেখকে বাদ দিতে হয়।

উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। তাদের অধিনায়ক রাজু শেঠি ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান রামন লাম্বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে জুনিয়র ইণ্ডিয়া দলে খেলেছিলেন। সে কারণে দক্ষিণাঞ্চলের আপত্তিতে তাদের দুজনকেই বাদ দেওয়া হয়।

উঠতি খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দেখিয়ে বড় আসরে স্থান পাওয়ার সুযোগ করে দেয় এই টুর্নামেন্ট। সেজন্য মনে হয় এই টুর্নামেন্ট যদি রাউণ্ড রবিন প্রথায় খেলা হত তাহলে তরুণদের সুযোগের পরিমাণ বাড়তে পারে।

হাওড়ার বক্সিং-এ সবার সেরা রতন মাহাতো

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাওড়া ঃ গত ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ওয়েস্ট এণ্ড ক্লাব রিং-এ আন্তঃস্কুল, কলেজ ও ক্লাব পর্যায়ের এক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল হাওড়া জেলা বক্সিং ফেডারেশন। হওড়া সহ অন্যান্য জেলা থেকেও মোট ৮০ জন মুষ্টিক যোগ দেন।

স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় জ্ঞান মন্দির (হাওড়া) এবং রানার্স বারাকপুর শিউলি হাই স্কুল (২৪ পরগণা)। ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ হুগলীর



হাওড়া জেলা বক্সিং ফেডারেশনের প্রতিযোগিতায় বিশিষ্টরা

মদন পাল।

কলেজ স্তরে নরসিংহ দত্ত ও হাওড়া হোমস যথাক্রমে প্রথম ২টি স্থান পায়। শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক সুদীন মুখার্জি। এবং, ক্লাবস্তরে ওয়েস্ট এণ্ড ক্লাব ও হুগলী জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। সবার সেরা রতন মাহাতো।

সমস্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে সাড়া জাগানো লড়াই হয়েছে গোলাপ বাস বনাম প্রণব দে, ভবতোষ আইচ বনাম শেখর মিত্র, স্বপন রাজবংশী বনাম শান্তি রায় এবং সোমনাথ মাহাতো বনাম রামসুন্দর দাস। সুদর্শন সাহা ২টি লড়াইতে প্রতিপক্ষকে নক আউট করে চমক সৃষ্টি করেন।

উল্লেখযোগ্য, চল্লিশ বছর ধরে হাওড়া জেলা বক্সিং ফেডারেশন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করছে। প্রথম দিন উদ্বোধনী ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে অনলস কর্মী, ফেডারেশন সম্পাদক শ্যামল দাসকে অভিনন্দিত করেন। তিনদিনে লায়নস ক্লাব সভাপতি আর এন লাখোটিয়া, শৈলেন মান্না, ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জি, পুলিস সুপার এস কে মুখার্জি, চেয়ারম্যান অলোকদূত দাস, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়ান স্পোর্টসের পর সুব্রতা অবসর নিলেন

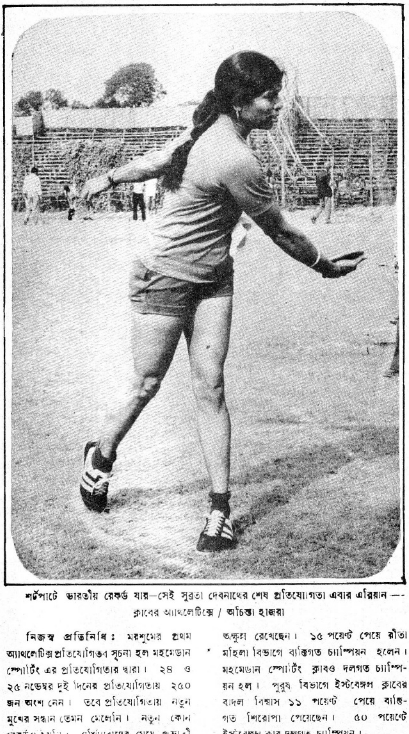
এরিয়ান ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টস ১ ও ২ ডিসেম্বরে নিজেদের মাঠে হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার আসরে প্রায় তিনশ প্রতিযোগী ছিলেন। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে নতুন সংযোজন হল শিশুদের জন্য কয়েকটি ইভেণ্ট। তবে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। মাত্র ৩০টি শিশু প্রতিযোগী যোগ দেয়। উদ্যোক্তারা প্রতিটি ক্ষুদে অ্যাথলিটের হাতেই পুরস্কার তুলে দেন। বড়দের প্রতিযোগিতার আসরে সুব্রতা দেবনাথ শর্টপাট ও ডিসকাস থ্রো ইভেণ্টে প্রথম হন। তিনিই একমাত্র বাংলার মহিলা অ্যাথলেটিক্স কোচ। সেদিন এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, এরিয়ান স্পোর্টসে এবারই তার শেষ যোগদান। এরপরে আর তিনি প্রতিযোগী হিসাবে অবতীর্ণ হবেন না। তিনি এখন বাংলায় মেয়েদের অ্যাথলেটিক্সে কোচিং দেবেন।

পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে মোহনবাগান ক্লাবের ইন্দর সিং ১৪ মিনিট ৩০·৫ সেকেণ্ড সময়ে রেকর্ড করলেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কে কে নায়ারের রেকর্ড সময় ছিল ১৫ মিনিট ১০·৬ সেকেণ্ড। ইন্দর সিং সার্ভিসেস দলের অ্যাথলিট, মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে নেমেছেন।

পুরুষ বিভাগে ৬৩ পয়েণ্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের মর্যাদা পেল মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। মহিলা বিভাগে ১৮ পয়েণ্ট পেয়ে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব চ্যাম্পিয়ন। ২৬ পয়েণ্টে এরিয়ান ক্লাব জুনিয়র বিভাগের চ্যাম্পিয়ন।

আট পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নের গৌরব পেলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রণজিৎ ঘোষ ও বাদল বিশ্বাস। মহিলা বিভাগে হলেন যুগ্মভাবে এরিয়ানের সুব্রতা দেবনাথ ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুরাধা। জুনিয়রে এরিয়ান ক্লাবের অসীম ঘোষ।

এবার কলকাতার প্রথম শ্রেণীর দুই অ্যাথলেটিক্স আসরে জেলার জুনিয়র ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশী। হাওড়া, চন্দননগর, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে বহু ছেলেমেয়ে ক্রীড়া উৎসবে যোগ দিয়েছে।



শর্টপাটে ভারতীয় রেকর্ড যার—সেই সুব্রতা দেবনাথের শেষ প্রতিযোগিতা এবার এরিয়ান — ক্লাবের অ্যাথলেটিক্সে / অচিন্ত্য হাজরা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মরশুমের প্রথম অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার সূচনা হল মহমেডান স্পোর্টিং এর প্রতিযোগিতার দ্বারা। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর দুই দিনের প্রতিযোগিতায় ২৫০ জন অংশ নেন। তবে প্রতিযোগিতায় নতুন মুখের সন্ধান তেমন মেলেনি। নতুন কোন রেকর্ডও হয়নি। মুর্শিদাবাদের মেয়ে প্রভাতী শীল ফিল্ড ইভেণ্টে সকলের নজর কেড়েছেন। সে শর্টপাটে ৯·৫৫ মিটার দূরত্ব করে মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে রীতা সেন প্রথম হয়ে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ১৫ পয়েণ্ট পেয়ে রীতা মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হলেন। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও দলগত চ্যাম্পিয়ন হল। পুরুষ বিভাগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বাদল বিশ্বাস ১১ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত শিরোপা পেয়েছেন। ৫০ পয়েণ্টে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দলগত চ্যাম্পিয়ন।

জুনিয়র বিভাগে বরাবরই এরিয়ান ক্লাবের প্রাধান্য বেশী। তারা ২১ পয়েণ্ট পেয়ে জুনিয়র বিভাগে সর্বোচ্চ স্থানটি এবারও দখল করেছে।

কৃষ্ণনগরে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স

২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। সেখানে প্রায় বারোটি জেলা থেকে চারশ প্রতিযোগী যোগদান করবে বলে রাজ্য অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অরুণ ব্যানার্জি জানালেন। জেলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অ্যাথলেটিক্সে উৎসাহ ও আগ্রহ বেড়েছে বলে তিনি মনে করেন।

টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম একশো বছরে সতেরজন অলরাউণ্ডারের কে সেরা (৯)

দিলীপ সরকার : ১৯৪৮ সিরিজে ইংল্যাণ্ড সফরে ঝড় তুলে, কিথ মিলার সর্বদা খেলার জন্য সুস্থ ছিলেন না। কোমরের ব্যথা তাকে কাবু করে দেয়। দেশের মাটিতে সে সময়ে তিনি কখনো বল করতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মরশুমে কিথ মিলারের আবির্ভাব ঘটতো নিছক একজন স্বাস্থ্য উদ্ধারের রোগীর মতোই।

কিন্তু ক্রিকেট বিশ্ব আরো একবার চমকে উঠলো যখন কিথ মিলার ১৯৪৯-৫০ সিরিজে দলের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দিলেন। সফরের গোড়ায় বিল জনস্টন মোটর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। মিলার অস্ট্রেলীয় দলকে সম্পূর্ণতা দিতে উড়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। এবং সবকটা টেস্টেই দুই তরফের মধ্যে একজন দুর্দান্ত কার্যকরী অলরাউণ্ডার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করলেন।

পাঁচ টেস্টের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া জয় পেয়েছিল ৪-০ ; হার্ভে সিরিজে চারটে সেঞ্চুরিসহ ৬৬০ রান করেন এবং মিলার ১৭টি উইকেট ও ২৪৬ রান করে চৌকস অলরাউণ্ডারের ভূমিকা পালন করেন। অস্ট্রেলিয়ার অন্য দুই অলরাউণ্ডার আয়ান জনসন ও রয় লিণ্ডওয়ালের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়।

এরপর ১৯৫০-৫১ সালে এফ আর ব্রাউনের ইংল্যাণ্ড দল যায় অস্ট্রেলিয়া সফরে। অস্ট্রেলিয়ার মরশুমে মিলার তখন একের পর এক সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নাম কিনেছেন। ব্রাউনের দলকে মিলার আবার বার বার গুটিয়ে দিলেন দারুণ বোলিং দ্বারা। ব্যাটিং-এও দুর্ধর্ষ ভূমিকায় ছিলেন মিলার।

সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৪-১ ম্যাচে জেতে। ব্রিসবেন ও মেলবোর্নে জয়ের পর অস্ট্রেলিয়া সিডনির তৃতীয় টেস্টেও জয় পায় মিলারের



কিথ মিলার

ভয়ঙ্কর ব্যাটিং ও বোলিং-এর জন্যই। হাটন, সিম্পসন, কম্পটন ও ওয়ারকে লাভ করেন মিলার ইংল্যাণ্ডের ২৯০ রানের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩৭ রানের বিনিময়ে। তারপর অস্ট্রেলিয়ার ৪২৬ রানের ইনিংসে মিলার ১৪৫ রান করেও অপরাজিত থেকে যান। চমৎকার ব্যাটিং পিচ সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ১২৩ রানে। স্লো বলের যাদুকর জে বি ইভারসন ২৭ রানে ছয়টি উইকেট নিয়েছিলেন।

এডিলেড ওভালের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রান করে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এ আর মরিসই সর্বোচ্চ (২০৬) রান করেন অস্ট্রেলিয়ান বাঁ-হাতি ক্রিকেটারদের মধ্যে। বেডসার, রাইট ও ট্যাটারশালের ইংল্যাণ্ড বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে মরিসের পরেই সতর্ক হয়ে খেলতে পেরেছিলেন একমাত্র কিথ মিলার (৪৪)।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় ২৭২ রানে। হাটন আরও একবার গোটা ইনিংসই ব্যাট হাতে উইকেটে ছিলেন (১৫৬ রান)। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া আট উইকেটে ৪০৩ রান তুলে ঘোষণা করে দেয়। বিশ বছর বয়স্ক জে ডবু বুক প্রথম টেস্টেই ১০১ রানে অপরাজিত ছিলেন। কিথ মিলার এক রানের জন্য শতরান থেকে বঞ্চিত হন রাইটের বলে বোল্ড হয়ে। মিলার (২৭-৩), জনস্টন ও জনসনের বোলিং দাপটে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২২৮ রানে শেষ হলে ফের অস্ট্রেলিয়া ২৭৪ রানে জয় পায়।

শেষ টেস্ট মেলবোর্নে ইংল্যাণ্ডের আট উইকেটে ঐতিহাসিক জয় হল। সেই ১৯৩৮ সালে হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড শেষবারের মতো জয় পেয়েছিল (কিংস্টন ওভালে) ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে। তারপর অস্ট্রেলিয়া একটানা পঁচিশটি টেস্টে সাংঘাতিকভাবে নাজেহাল করে ইংল্যাণ্ডকে একটিতেও না জিততে দিয়ে (কুড়িটিতে জয় ও পাঁচটি ড্র)।

এই টেস্টে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে মিলার লাভ করেন ওয়াশব্রুক, শেপার্ড ইভানস ও ট্যাটারশালের উইকেট। সিম্পসন অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে একমাত্র শতরানটি করেন তার ৩১তম জন্মদিনে। ১৫৬ রানেও তিনি নট আউট থাকেন এবং শেষ উইকেটে ট্যাটারশালের সঙ্গে ৫৫ মিনিটে যোগ করে ফেলেন ৭৪ রান। ইংল্যাণ্ডের এই ঐতিহাসিক জয়ে মস্ত ভূমিকা নেন বেডসার অস্ট্রেলিয়ার উভয় ইনিংসেই পাঁচটি করে উইকেট নিয়ে।

এরপর মিলার টেস্ট খেলেন সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। সারা বিশ্বের ক্রিকেট মহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তখন ঝড়ের গতিতে নাম ছড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে জে ডি গডার্ডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডকে পর্যুদস্ত করে এসেছে চার টেস্টের সিরিজে ৩-১ জয়ী হয়ে। স্টোলমেয়ার, এ এফ রেই, রামাধিন এবং ভেলেনটাইন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে এমন কয়েকটি নাম ছিলেন, যারা আর সব দেশের ক্রিকেটারের ভীতির কারণ ঘটিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই ঝড় তোলা বাহিনীকে দেখার জন্য সারা বিশ্ব ছিল অপেক্ষায়। ১৯৫০ সালের সিরিজে ক্যারিবিয়ান সংবাদপত্রের জন্য লণ্ডন থেকে খবর পাঠাতেন জিমি কোজার। জিমি এক



অফ বল লেগে এবং লেগ বল অফে খেলাতে ওস্তাদ উলি হ্যামণ্ড

মন্তব্য পাঠালেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার এলান কিপাক্সের মুখ থেকে নিয়ে 'অস্ট্রেলিয়ায় গেলে তোমরা শেষ হয়ে যাবে। ওদের তোমরা আগে নিজের দেশে নিয়ে যাও এবং জয়ের চেষ্টা কর।'

কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ড ইংল্যাণ্ড সফর শেষ না হতেই অস্ট্রেলিয়ানদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছল। বৃদ্ধ এলান কিপাক্স যা বলেছিলেন তাই ফলল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১-৪ ম্যাচে হারল অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে। একুশ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম সফরে গিয়েও ক্যারিবিয়ানরা একই ফলে হেরেছিল।

ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে রামাধিন ও ভেলেনটাইনের সঙ্গে শেষ বলটি পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই দিয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হলো তিন উইকেটে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক গডার্ড রামাধিন ও ভেলেনটাইনকে দিয়ে ১৫০.৪ ওভারের মধ্যে ১২৯.৭ ওভার বল করিয়ে-

ছিলেন। উভয়েই ছটি করে উইকেট পেয়েছিলেন। মিলার রান করেন ৪৬ ও চার। উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র দুটি।

১৯৩০-৩১ মরশুমে সিডনিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই সুখ-স্মৃতির আবির্ভাব এবারে ঘটল না। সিডনির এই দ্বিতীয় টেস্টেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারল সাত উইকেটে। ওরেল, ওয়ালকট, ক্রিস্টিয়ানি ও গোমেজ—সকলের অর্ধশত রান পার হবার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৬২ রানের এক প্রশংসনীয় প্রথম ইনিংস গড়তে পেরেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসেই ১৫৫ রানে এগিয়ে রইল কিথ মিলারের ১২৯ রানের অসাধারণ ব্যাটিং-এর জন্যই। মিলার ও হাসেট শতরান করে চতুর্থ উইকেটে ২৩৫ রান যোগ করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসও গুটিয়ে গেল ২৯০ রানে যাতে মিলার উইকেট নিয়েছিলেন তিনজন সেরা ব্যাটসম্যানের। অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ১৩৭ রান তুলে ফেললে জয় আসে।

এডিলেড ওভালে তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয় পেল ছয় উইকেটে। টসে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করাই বেছে নেয় বৃষ্টি-বিধৌত পিচে এবং আজও পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কম রানের ইনিংস গড়ে (৮২)। প্রথম দিনেই খেলাটায় ২২টি উইকেট পড়ে ২০৭ রানের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে সংহারক ছিলেন ওরেল মাত্র ৩৮ রানে ছয় উইকেট নিয়ে। আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে অপর এক বাঁ-হাতি মিডিয়াম পেসার জনস্টন ছয় উইকেট নিলেন ৬২ রানে। প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়া ২০ রানে দু'উইকেট হারিয়েছিল। শেষে ডি টি রিং ও কিথ মিলারের দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে সম্মানজনক রান করল—২৫৫ : সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ লড়াই-এ ফিরে আসতে পারে যদি তারা প্রয়োজনীয় ২৩৩ রান করতে পারেন দ্বিতীয় ইনিংসে। এ সময়ে ভিজে উইকেটে টান ধরে এবং ব্যবহারেরও ঘটে উন্নতি। মার্শাল এবং স্টোলমেয়ার জয়ের ভিত গড়ে দেন প্রথম উইকেটে ৭২ রান তুলে। অবশেষে জয় হলো।

যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মেলবোর্নে হওয়া চতুর্থ টেস্টে জয়ী হতো তবে শেষ টেস্ট থাকতো উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত এবং জমজমাট লড়াই-এর জন্যেও। কিন্তু তাও হতে পারেনি।

ওরেলের দারুণ উৎসাহজনক ১০৮ রান সহ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ২৭২ রান করেছিল। মাত্র ২৯ রানের মধ্যেই কিথ মিলার দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দেন। এরপরও মিলার দুর্দান্ত হয়ে ওঠেন এবং গোমেজ, অধিনায়ক গডার্ড ও ভেলেনটাইনের উইকেট নেন। ইনিংসে মিলারের বোলিং ছিল ১৯·৩-১-৬০-৫ ; লিণ্ডওয়াল, মিলার ও জনস্টনের দাপটে ওরেল ছাড়া আর কোন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড় উইকেটে টিকে থাকতে পারেননি।

প্রত্যুত্তর দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া কেবল একটি পার্টনারশিপের দৌলতে। চতুর্থ উইকেটে কিথ মিলার ও হার্ভে ১২৪ রান যোগ করেছিলেন ২১৬ রানের ইনিংসে। মিলারের ব্যাটিং ছিল (৪৭) দলের ভাঙনরোধে এক বিশাল প্রতিরোধ। তাদের শেষ পাঁচটি উইকেট খোয়া যায় মাত্র ৮ রানের মধ্যে। এই ধ্বংস কাজে রামাধিন, ভেলেনটাইন, গোমেজ বা ওরেল কেউ ছিলেন না। ছিলেন ফাস্ট বোলার জে ট্রিম। ট্রিম তার শেষ ছয় ওভারে ১২ রানে চারটি উইকেট পান এবং ইনিংসে লাভ করেন ৩৪ রানে পাঁচ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৬ রানে এগিয়ে—দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু অধিনায়ক গডার্ড হঠাৎ ব্যাটিং অর্ডারের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন। ওপেনার দু'জন থিতু হবার আগেই লিণ্ডওয়াল প্রথম ওভারেই তাদের আউট করে দেন শূন্য রানে। পরে স্টোলমেয়ার ও গোমেজ একটু দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে শুরু করলেও, মিলার কিন্তু অপেক্ষা করেননি। স্টোলমেয়ারকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেন মিলার। এরপর ক্রিস্টিয়ানি (৩৩) ধৈর্যের ব্যাটিং শুরু করেন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪ রানে পৌঁছে যায়। কিন্তু এবারও মিলার বাদ সাধলেন ক্যারিবিয়ানদের সাধে। ক্রিস্টিয়ানিকে সরাসরি বোল্ড করলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস গুটিয়ে যায় ২০৩ রানে। চমৎকার ফিল্ডিং মারফতে মিলার রান আউট করেন ট্রিম ও ভেলেনটাইনকে। ম্যাচে তার ১০৯ রানে আট উইকেট লাভ হলো।

অস্ট্রেলিয়াকে ২৬০ রান করতে হবে শেষ দিনটিতে। কিন্তু পিচ তখন চলে গেছে সম্পূর্ণ বোলারদের কব্জায়। কেবল হাসেটের সেঞ্চুরি ছাড়া কোন অস্ট্রেলিয়ান টিকে থাকতে পারেননি রামাধিন ও ভেলেনটাইনের যুগ্ম আক্রমণের মুখে। ৯টা উইকেট পড়ে গেছে ২২২ রানেই। নয় নম্বর ব্যাটসম্যান রিং ও এগার নম্বর জনস্টন রয়েছেন ক্রিজে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ের দরজায়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার শেষ জুটি অসাধ্য কাজকে সফল করে তুললেন। পৌনে একঘণ্টা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রিং সুইং বলকে বশে এনে রান তুলতে লাগলেন এবং তাকে চমৎকার সাহচর্য দিতে থাকলেন জনস্টন সহজেই একটি করে রান নিয়ে। প্রয়োজনীয় ৩৮ রান তুলতেই অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে জয়ী হয়।

শেষ টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া ২০২ রানে জয় পায় আবার কিথ মিলারের ভয়ংকর বোলিং-এর দৌলতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৭৮ রানের প্রথম ইনিংস আজও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কম রানের। অস্ট্রেলিয়ার ১১৬ রানের উত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কেউ ১৩ রানের বেশি এগুতে পারেননি। জনস্টন ও লিণ্ডওয়ালের পাঁচ উইকেট ভাগের পরই ধ্বংস কাজে উগ্রমূর্তি ধরলেন কিথ মিলার। ক্রিস্টিয়ানির উইকেট পাবার পরই মিলার মাত্র ১৫ রান খরচা করে বোল্ড করলেন ওরেল, গোমেজ ও অ্যাটকিনসনকে। ইনিংসে কিথ মিলারের বোলিং ছিল ৭·৬-১-২৬-৫।


ইন-সুইঙ্গার ও লেগ-কাটারে বিশ্বখ্যাত আলেক্স বেডসার

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে (৩৭৭) মিলারই সর্বোচ্চ রান করেন ৬৯; স্টোলমেয়ারের ১০৪ রান ছাড়া দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের কেউই তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। লিণ্ডওয়াল ও মিলার জুটি অস্ট্রেলিয়ার জয়ের জন্য আবার মেতে উঠলেন এবং সাফল্য পেলেন উভয়ে সাতটি উইকেট দখল করে।

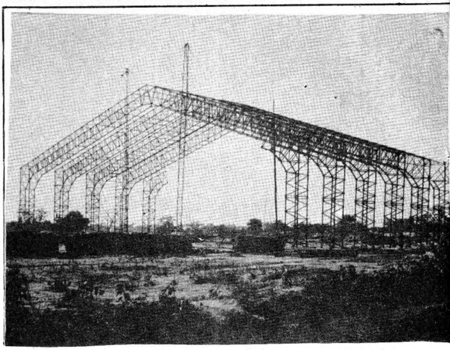
এই সিরিজে ৩৬২ রান করে এবং কুড়িটি উইকেট দখলে কিথ মিলার ফের প্রমাণ করলেন নিজেকে দুর্ধর্ষ অল-রাউণ্ডার হিসেবে।

(চলবে)

দুর্গাপুরে জাতীয় টেবল টেনিস পিছিয়ে যেতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার: জানুয়ারির ২৭ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারির ৫ পর্যন্ত দুর্গাপুরে জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস হওয়ার কথা ছিল দুর্গাপুরের টেবল টেনিসের আসর বর্ধমান জেলা টেবল টেনিস সংস্থার পরিচালনায়, কিন্তু একই সময়ে কলকাতায় ভারত-পাকিস্তান টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসছে। সম্ভবতঃ সাতদিন পিছিয়ে যাচ্ছে। যদি পিছিয়ে যায় তবে ৭ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিযোগিতাটি হওয়ার সম্ভাবনা। জাতীয় টেবল টেনিসের শেষে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দলীয় টেবল টেনিস হওয়ার কথা ছিল সেটি দুর্গাপুরের বদলে দিল্লিতে হবে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা খেলবে এমন প্রতিযোগিতা রাজধানী দিল্লিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে টি টি এফ আইয়ের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তার ধারণা।

পরে জানা গেছে পঞ্চদলীয় টুর্নামেন্ট সম্ভবত ৪/৫ ফেব্রুয়ারীতে দুর্গাপুরে হবে।



দুর্গাপুরের টেবল টেনিস আসর বসবে এখানেই — তারই প্রস্তুতি

প্রথমে কথা ছিল দুর্গাপুর এক্‌জিবিশন গ্রাউণ্ডে ৭ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী স্টেডিয়াম তৈরি করে সেখানেই খেলা হবে। যেটি তৈরি করতে খরচ হত আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই মুহূর্তে আগের পরিকল্পনার বদলে দুর্গাপুরে একটি স্থায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে। স্টেডিয়ামটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কানু-সিধু স্টেডিয়াম'। উল্লেখ্য সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নায়ক ছিল কানু ও সিধু। স্টেডিয়ামটিতে ৬ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারবেন। স্টেডিয়াম তৈরির খরচ ৬০ লক্ষ টাকার সিংহভাগ বহন করবে দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি।

দুর্গাপুরে একটি স্টেডিয়াম তৈরির চিন্তা ডি এন এ এ-র বহুদিন থেকেই ছিল। সেটি এখন বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। ২৯ আগস্ট ডি এন এ এ-র কর্তৃপক্ষ, টুর্নামেন্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট বর্ধমানের জেলাশাসক জে ভি আর রাও, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নিখিলেশ দাস (এস ডি ও), জেলা টেবল টেনিস সংস্থা ও রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন স্টেডিয়াম তৈরির ব্যাপারে। এবং শেষ পর্যন্ত যৌথভাবে স্টেডিয়াম গড়ার সিদ্ধান্ত নেন ডি এন এ এ-র কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্টেডিয়াম তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে অক্টোবরের গোড়ার দিকে। যেভাবে নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে তাতে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্টেডিয়ামের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ধারণা। প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৭৫ সালে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিসকে ঘিরেই নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছিল। দুর্গাপুরের কানু-সিধু স্টেডিয়ামটি হওয়ার পিছনে পুরোপুরি না হলেও টেবল টেনিসের বিরাট অবদান থাকবে।

রাজহরা মাইন্‌স-এ শিশুমেলা

সংবাদদাতা: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে দু'দিন ধরে রাজহরা স্টেডিয়ামে রাজহরা মাইনসের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালিত হয়।

রাজহরা খনি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন।

সিনিয়র বয়েজ গ্রুপে রাজহরা এক নম্বর হাইস্কুলের ছাত্র সুরেশ বর্মা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়। পনেরোর নীচে শ্রীরমন, ছয় বছরের নীচে বালিকা গ্রুপে মহামায়া, আয়রন ওর মাইনসের বিমলা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। মোট ২০৮ পয়েন্টে রাজহরা এক নম্বর হাইস্কুল টিম চ্যাম্পিয়ন হয়। মহামায়া স্কুল পায় ৬৮ পয়েন্ট। জুনিয়র টিম চ্যাম্পিয়ন হয় আয়রন মাইনসের ২২ নম্বর স্কুল।

প্রতিযোগিতার শেষে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দেন রাজহরা খনি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শিবস্বামী ও স্পোর্টস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও খনি অ্যাথলেটিক্সের কোচ সুজয় ঘোষ।

মস্কো '৮০

প্রাচীন ওলিম্পিয়া এখন কেমন আছে ?

অতীন সরকার

আগামী ১৯৮০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য ২২তম ওলিম্পিকে যে মশাল জ্বলবে তা প্রজ্বলিত করে আনা হবে প্রাচীন ওলিম্পিক নগরী এথেন্সের ওলিম্পিয়া থেকে এবং সূর্য-রশ্মি থেকে তাপ নিয়ে সেই মশাল জ্বালানো হবে। দৌড়বীরগণ তা বহন করবেন এথেন্স থেকে মস্কোর লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই ওলিম্পিক অনুরাগীদের কাছে এথেন্স সম্পর্কে জানবার আগ্রহ রয়েছে। তিন হাজার বছর আগেকার প্রাচীন এথেন্স, আধুনিক ওলিম্পিকের প্রথম অনুষ্ঠান নগরী এথেন্স এখন কেমন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই নিবন্ধ রচিত।

সেই এথেন্স-এর ওলিম্পিয়া নগরীতে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওলিম্পিক ক্রীড়া। আর ওই মিলন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস-১-এর রাজত্বে পৌত্তলিকতার অজুহাতে। তার ৩২ বছর পরে ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস-২ হুকুম দিলেন ওলিম্পিয়াকে জ্বালিয়ে দিতে। তাঁর নির্দেশে দেব-দেবীদের সিংহাসনচ্যুত করে ওলিম্পিয়াকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হল।

একশ বছরের কিছু আগে গ্রীক কৃষকরা পাথর কেটে গাড়ি বোঝাই করে আনল সেই জমকালো আলটিস মূর্তির মন্দির থেকে। সেই থেকেই ওলিম্পিয়া সম্পর্কে জানবার আগ্রহ। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ গত ১০০ বছর ধরে সযত্নে খনন করে উদ্ধার করেছেন প্রাচীন ওলিম্পিয়াকে। এখনও চলছে সেই খননের কাজ। আজকের পৃথিবীর মানুষ, বিশেষভাবে গ্রীসের মানুষ এইভাবেই খ্রীষ্ট-ধর্মান্ধ সম্রাটের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। বর্তমানে মানব সভ্যতার সামনে তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীন সভ্যতাকে।

আজ ধ্বংস স্তূপ থেকে উঠে আসা ওলিম্পিয়া নগরী পর্যটকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। আর ওলিম্পিয়ায় পাওয়া পুরাকীর্তি সারা বিশ্বের যাদুঘরগুলির আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি সোভিয়েত ওলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকে নিও কলোদনী আজকের এথেন্স সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশ করেছেন। ওই বিবরণ থেকে এথেন্স সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব।



২২ তম ওলিম্পিকে বিজয়ীদের জন্য পদক পুরনো ওলিম্পিয়ার স্মৃতি বহন করছে

সাধারণ পর্যটকগণ গ্রীসের গ্রামাঞ্চল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় দেখতে পান না সবুজ ফসলে ঢাকা প্রান্তরে কত প্রাচীন গ্রীক নগরী লুকিয়ে রয়েছে। পারনাসাস পাহাড়ের গায়ে এখনও লেপটে আছে দেবী ডেলফি। আজও কাস্টালিয়ান জলপ্রপাত আছড়ে পড়ছে শিলা-খণ্ডের উপর, যেমন পড়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। কিন্তু প্রাচীন মাইসেনি পাহাড়গুলির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যে জমকালো এপিডরাস থিয়েটারে পাথরের আসনে হাজার হাজার মানুষ বসতেন, তা আজ পর্বতরাজির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

এককালের মহানগরী ওলিম্পিয়া ভূমিকম্প, যুদ্ধ আর কালস্রোতে অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক নগরীর মত জনশূন্য, অজ্ঞাত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

কয়েক যুগ ধরে পুরাতত্ত্ববিদগণ গ্রীসের মাটি খুঁড়ে চলেছেন চাপা পড়া প্রাচীন পাথর-গুলিকে উদ্ধার করবার জন্য। বহুসংখ্যক স্থান থেকে 'ন্যারোগেজ' রেল পথে সেই প্রাচীন পাথর বয়ে আনা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জুড়ে দাঁড় করানো হয়েছে সেইসব স্তম্ভ। যেখানে হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীকবাসী দাঁড়াতেন। আজ আবার সম্ভব হচ্ছে সেই পরিত্যক্ত শহরের জনহীন পথ দিয়ে চলা, যে পথ একদিন প্রাচীন পৃথিবীর ক্রীড়াবিদদের পদধ্বনিতে মুখরিত হত। সম্ভব হচ্ছে সেই এম্ফি থিয়েটারের পাথর কাটা বেঞ্চে বসা, যেখান থেকে আজও প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

ওলিম্পিয়া—বিশ্বের প্রথম স্টেডিয়াম মাস্পথ, সেই নগরী আজ বসতিহীন। কিন্তু প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় থেকে পথগুলি থাকে জনব্যস্ত। পর্যটকগণ গ্রীসে এলে অবশ্যই ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন দেখতে ভোলেন না।

শহরের প্রবেশ পথে কোন সাইনবোর্ড নেই, নেই চোখ জুড়ানো কোন আকর্ষণ। কিন্তু ঘাসে ঢাকা পাথরের ধাপ ধরে উঠতেই পাওয়া যায় ওলিম্পিয়ায় যাওয়ার প্রাচীন গ্রীকদের পথ। পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে এগিয়ে গেলে আলফিউস নদীর উত্তর দিকে শস্যশ্যামল উপত্যকার চতুর্দিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ওলিম্পিয়ার কেন্দ্রস্থলে সেই পবিত্র 'আলটিস' বন। একসময়ে এই বন ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আজ সেই দেওয়াল ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেই ভগ্নস্তূপ-এর বাধা পেরিয়ে ঢুকতে হবে ওলিম্পিয়ায়।

শহরের শুরুতেই জিমন্যাসিয়াম। এখানেই প্রাচীন গ্রীসের অ্যাথলীটরা ট্রেনিং নিতেন। এখানেই অনুষ্ঠিত হত ওলিম্পিকে অংশ-গ্রহণের আগেকার প্রারম্ভিক প্রতিযোগিতাগুলি।

জিমন্যাসিয়ামের একদিকে থামের উপরে একটি চাঁদোয়া। এই ঢাকা জায়গায় করত অনুশীলন। এখানেই বৃষ্টির দিনে প্রতিযোগিতা হতে পারত। জিমন্যাসিয়ামের সামনে উঠোন। এই উঠোন থেকেই প্রাচীন ওলিম্পিক শুরুর আগে প্রতিযোগীরা সমবেত হতেন প্রারম্ভিক শোভাযাত্রার (কুচকাওয়াজ) জন্য। যে পথ ধরে শোভাযাত্রা যেত, তা আজকের দিনের হিসাবে কিছুটা সরু।

জিমন্যাসিয়ামের কয়েক পা দূরেই আর একটি চত্বর। ঠিক একই রকমের কাঠামো—৬৬ মিটার দীর্ঘ—৫৩.৬ মিটার প্রশস্ত চারকোণা 'প্যালেস্ট্রা' (কুস্তির আখড়া)। এখানেই হোত আজকের দিনের মুষ্টিযুদ্ধের প্রাচীন সংস্করণ। এটা ছিল তখনকার দিনের ক্রীড়াসূচীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্যালেস্ট্রার চারদিকেই বারান্দা। ভেতরের দিকে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। এগুলি ব্যবহৃত হত স্নানের ঘরসহ নানা ধরনের কাজে। পাথর খোদাই করে তৈরী দুটি 'বাথ টাব' এখন বৃষ্টির জলে ভরে থাকে। অবশ্যই ওই দুটি আছে সেই আগের জায়গায়।

জিমন্যাসিয়ামের পিছনে রয়েছে এই ক্রীড়া সমাহারের বৃহত্তম বাড়ি—লিওনিডায়াম। এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল তখনকার বিত্তশালী ব্যক্তি লিওনিড-এর অর্থে। এই বাড়িটি জিমন্যাস্টিক্স-এর জন্যও ব্যবহৃত হত। ওলিম্পিকের বিশিষ্ট অতিথিদের থাকতে দেওয়া হত এই বাড়িরই অন্যান্য ঘরে।

ওই বাড়ির পাশ দিয়ে মিছিল এগিয়ে যেত আলটিস-এর মধ্য দিয়ে বিখ্যাত জিউস মন্দির-এর পাশ কাটিয়ে। এই দেবী জিউসকেই প্রাচীন গ্রীকগণ ওলিম্পিকের উপদেষ্টা বলে মনে করতেন।

তখনকার প্রখ্যাত শিল্পী ফেডিয়াস ওই মন্দিরের জন্য জিউসের মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন সোনা আর হাতির দাঁত দিয়ে। পুরাতত্ত্বিবদগণ মন্দিরটি উদ্ধার (খনন করে) করার পরে জলপাই তেলের দাগও খুঁজে পেয়েছেন। ওই তেল দিয়েই দেবী মূর্তিটি সুরক্ষিত রাখা হত। আটশ' বছর ধরে মূর্তিটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল (কনস্টান্টিনোপল-এ সরিয়ে নেবার আগে) তার কোন চিহ্নই এখন আর নেই। তবে একটি মুদ্রা আছে। এই মুদ্রার উপরে অঙ্কিত (খোদিত) চিত্র থেকে জানা গেছে, জিউস মূর্তি একটি সিংহাসনে বসানো ছিল। তাঁর এক হাতে ছিল রাজদণ্ড আর অন্য হাতে সাফল্যের দেবী ডানাওয়ালা 'নাইক'-এর প্রতিমূর্তি। সিংহাসনের সামনেই ছিল একটি অগভীর পাত্র। সম্ভবত এই পাত্রে জল রাখা হত এবং ওই জলে আয়নার মত দেবী মূর্তি প্রতিবিম্বিত হত।

জিউসের মন্দির থেকে কম পূজিত হত না হেরা মন্দির। এই মন্দির ছিল কিছুটা ছোট। তা হলেও বারান্দাটা ৬ ডোরিস চওড়া এবং ১৩ ডোরিস দীর্ঘ। এর সামনেই আছে বিশাল পতাকা দণ্ডের বেদী। কাছেই আছে পুরাতত্ত্ববিদদের তাঁবু ও মাটি বোঝাই রেল গাড়ির ছোট ওয়াগন। শ্বেত পাথর খোদাইকারগণ সেখানে কাজ করছেন। তারাই সম্প্রতি তৈরি করেছেন একটি নতুন সাদা বারান্দা। এখানেই ছিল দু'হাজার বছর আগে অনুরূপ বারান্দা।

ওলিম্পিকে হেরা মন্দিরের অবদান আছে। প্রতি চার বছর পরে এখানেই সূর্যালোক থেকে ওলিম্পিক মশাল প্রজ্জলিত হয়ে থাকে।

আলটিস-এ দেব-দেবীর স্মারক স্তম্ভ ছাড়া অন্য স্মারকও আছে। জলপাই পাতার মুকুটে ভূষিত ওলিম্পিক বিজয়ীরা তিনটি কারণে এখানে স্মারক স্তম্ভ তৈরি করতে পারতেন। কার্টনের মিলন ছিলেন অসাধারণ শক্তিধর। ছ'বার ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এই ব্যক্তি নিজের সমমাপের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি নিজ কাঁধে এই বনে বয়ে এনে সমসাময়িকদের বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

একটা সাদা পাথর খণ্ডে লেখা আছে—জনৈক রিবন ওই ১৪০ কিলোগ্রাম ওজনের পাথরটি এক হাতে নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

অতীতের আলটিস থেকে একটি সুড়ঙ্গ প্রাচীন স্টেডিয়ামে গিয়েছে, সম্প্রতি তা' খনন করে উদ্ধার করা গেছে। যে কোন দর্শক এখন ওই স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেখতে পারেন। মনে হবে প্রকৃতি যেন নিজ হাতে ক্রীড়াঙ্গনটি তৈরি করেছে। ক্রনিয়নের ঢালুর উত্তর দিক দেখলে মনে হয় ঘাসে ঢাকা মাঠের মধ্যে স্বাভাবিক একটি বিজয় মঞ্চ। অন্য তিন দিকের প্রশস্ত থাক এতই সোজা যেন মানুষের হাতের কাজকেও হার মানায়। উত্তর দিকে ঢালু জায়গার ঠিক মাঝখানে একটি বসার জায়গা। এখানেই ওলিম্পিকের একমাত্র মহিলা—দেবী ডিমিটার-এর পূজারিণী বসতেন।

স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে গোটা পঞ্চাশেক আসন আছে। ওখানে বসতেন ওলিম্পিক সংগঠকগণ। ক্রীড়াঙ্গনের চার দিকের অন্যান্য ঢালু জায়গায় বসতেন অপর দর্শকগণ। আসন সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ হাজার। উন্মুক্ত সূর্যতাপেই তাঁদের বসতে হত। তখন গ্রীকরা পবিত্র তীর্থ মনে করে এখানে আসতেন—শান্তি ও মৈত্রীর প্রেরণায়।

কে না এসেছেন এখানে। সক্রেটিস প্রতিবারই পায়ে হেঁটে ওলিম্পিক ক্রীড়ায় আসতেন। এসেছিলেন মেসিডন থেকে আলেকজাণ্ডার। আর এসেছিলেন পিথাগোরাস ও নীরো। চার বছর পরে পরে এই ওলিম্পিক দিয়েই গ্রীকরা তখন সময়ের পরিমাপ করত। সেই ওলিম্পিয়া তিন হাজার বছর পরেও মানুষের কাছে স্মরণীয়, বরণীয়।



ওলিম্পিক স্মারক-পদক, ঐতিহ্যবাহী ক্রেমলিনের (মস্কো) দৃশ্য।

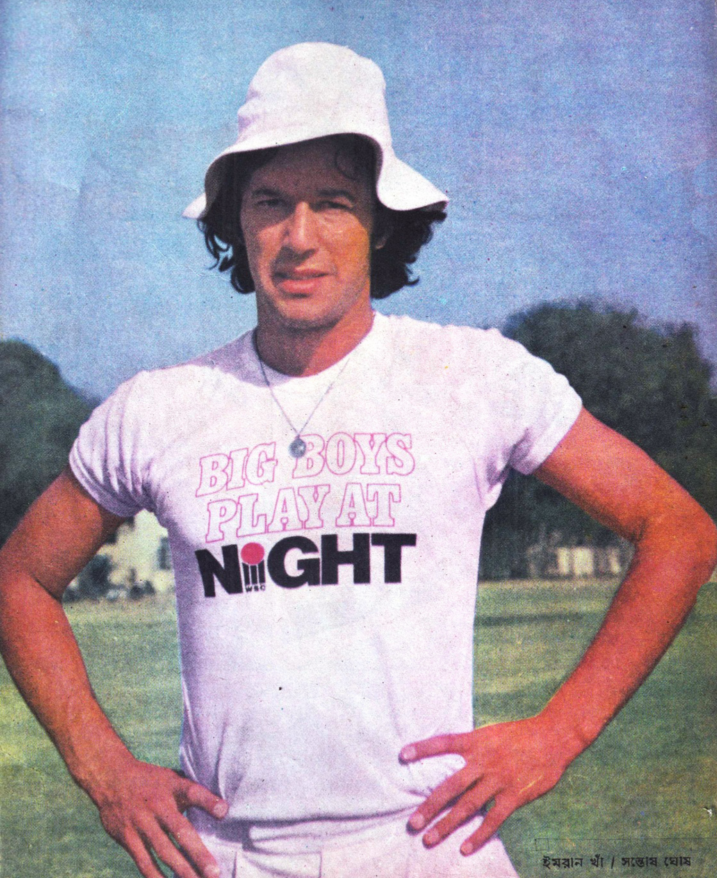
মুদ্রক ও প্রকাশক-ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিন্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯ থেকে প্রকাশিত।

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাউয়ার,
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 14th December 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



ইমরান খাঁ / সন্তোষ ঘোষ